কিশোর গ্রন্থাবলী

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়

ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ-শিল্পী :
শ্রীমৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়

ছবি :
শ্রীঅরুণ সেন,
শ্রীঅশোক ধর

মুদ্রণ :
শ্রীহরিপদ পাত্র
সত্যনারায়ণ প্রেস,
১, রমাপ্রসাদ রায় লেন,
কলিকাতা-৬

প্রকাশন :
শ্রীপরাণচন্দ্র মণ্ডল
ক্যালকাটা পাবলিশার্স,
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

ব্লক তৈরী :
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং,
১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
মোহন মুদ্রণী,
২, কার্তিক বসু লেন,
কলিকাতা-৯

গ্রন্থন :
ব্যানার্জী এণ্ড কোং,
১০১, বৈঠকখানা রোড,
কলিকাতা-৯

মূল্য চার টাকা মাত্র

উৎসর্গ

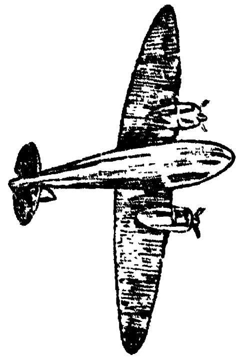
আমার পরম স্নেহের পুত্রসম জামাতা
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসুকে
ও
আমার পরম আদরের প্রাণাধিকা ভ্রাতুষ্পুত্রী
প্রখ্যাতা সঙ্গীতশিল্পী
শ্রীমতী মালবিকা কাননকে

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়

মহালয়া
১৩৬৭

সূচী ঃ





অভিশপ্ত

এক

বাপ-মায়ের একমাত্র মেয়ে—ভাইয়েদের একটি মাত্র ছোট বোন যদি অভিমান করে দু'দিন ধরে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে ঘরে দরজা দিয়ে শুয়ে থাকে, তাহলে তার ইচ্ছার অনুকূলে মত দেওয়া ছাড়া আর উপায় কী? তার ইচ্ছাটা হয়ত সত্যি অসাধারণ, কোন বাপ-মাই হয়ত তার এ ইচ্ছায় কোনমতেই রাজি হতে পারেন না—কিন্তু মেয়ে যদি তার ইচ্ছার অনুকূলে মত না দেওয়ার দরুন অনাহারে প্রাণত্যাগ করবে মনস্থ করে বসে থাকে, তাহলে কী করতে পারে মানুষ?

বিজয়বাবুর ছোট ছেলে রণজিত—চলেছে এরোপ্লেন চালিয়ে অস্ট্রেলিয়ায়। সে তাদের ফ্লাইং ক্লাবের 'A' ক্লাস লাইসেন্স তো পেয়েছেই কয়েকদিনের মধ্যেই, সম্প্রতি আবার তার চেয়ে সম্মানকর অর্থাৎ 'B' ক্লাস লাইসেন্স নিয়ে এসেছে বিলেত থেকে। চমৎকার চালায় সে এরোপ্লেন, অদ্ভুত তার দক্ষতা ঐ বিমানচারী যন্ত্রটিকে অধীনে রাখবার। ঐ যন্ত্রটি যেন ওর হাতের একটি খেলনা মাত্র। ওদের ফ্লাইং ক্লাবের ও এক মহা গৌরব। বয়স তো ওর মাত্র বাইশ, এরই মধ্যে ওদের ক্লাবের সমস্ত সুদক্ষ বিমান-চালকদের হার স্বীকার করতে হয়েছে ওর দক্ষতার কাছে। রণজিত তাই চলেছে দু'চার দিনের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ায়—একটা স্পীডের রেকর্ড করবে, মনে এই বাসনা নিয়ে। কিন্তু তার এই বিমানপথে জয়যাত্রায় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে তারই ছোট বোন ইরা। কী কুক্ষণে সে ইরাকে তাদের ফ্লাইং ক্লাবের মেম্বর করে দিয়েছিল। আশ্চর্য মেয়েটার দক্ষতা! ও যেন এ দেশেরই মেয়ে নয়; ওর জন্মানো উচিত ছিল ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, জার্মানি বা নিউজিল্যাণ্ড জাতীয় কোনো একটা দেশে। বয়স বোধহয় ওর এখনো

কুড়ি পার হয়নি, কিন্তু সাঁতারে রাইডিংএ শিকারে মোটর চালানোয় ছেলেদের মধ্যেও ওর জুড়ি মেলা ভার। এইতো সেদিন ও ঘণ্টায় আশী মাইল বেগে মোটর চালালো গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডে। সে এক দেখবার মত ব্যাপার! নক্ষত্রবেগে ছুটেছে ইরার ল্যান্‌সিয়া কার; আশে-পাশের গাছপালা, মাঠঘাট যেন বিদ্যুৎ-ঝলকের মত চোখের সামনে এসেই মিলিয়ে যাচ্ছে। ইরার শাড়ীর প্রান্তভাগ উড়ছে— উড়ছে ইরার চুলগুলি বাতাসে; ইরার মুখে চোখে সে কী এক উত্তেজনা! স্টিয়ারিং হুইলটি ধরে আছে সে দৃঢ়ভাবে! মোটরের স্পীড বেড়ে চলেছে ক্রমশঃ। সামনে মিটারে স্পীডের কাঁটা পঞ্চাশ মাইলের ঘর থেকে ষাট মাইলের ঘরে, ষাটের ঘর থেকে সত্তর-পঁচাত্তর,—ক্রমশঃ আশী মাইলের ঘরে এসে কাঁটা থর্‌থর্‌ করে কাঁপতে লাগল। ইরার পাশে বসে তার একাধারে দাদা, সঙ্গী, গুরু রণজিত। রণজিতের মুখে আনন্দের, উত্তেজনার চিহ্ন ফুটে উঠেছে। তারই বোন, তারই শিষ্যা ইরা—নিজের কৃতিত্বের চেয়ে শিষ্য বা শিষ্যার কৃতিত্বে মন আরো বেশী আনন্দে নেচে ওঠে। ইরা তার কলেজের মেয়েদের কাছে একটা মহা বিস্ময়, একটা ভীষণ আতঙ্ক। সকলেই ভাবে, এমন কোনো দুঃসাহসের কাজ নেই যা করা ইরার পক্ষে অসম্ভব। ও যেন সাগর-পারের মেয়ে। এইসব কারণেই না ইরাকে রণজিত এরোপ্লেনের পাইলটগিরি শেখাবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠেছিল অত! ইরার বাপ-মা এতদিন পর্যন্ত সাঁতারে রাইডিংএ ড্রাইভিংএ বা শিকারে উৎসাহ না দিলেও বাধা দেন নি। কিন্তু আকাশে ওড়া? তাঁরা প্রথমটায় মোটেই রাজি হন নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইরার জিদে এবং রণজিতের অনুরোধে তাঁরা মত দিতে বাধ্য হলেন তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও। দু-চার দিনের মধ্যেই ইরাও বেশ শিখে নিল পাইলটের কাজ। সকলকে অবাক করে দিয়ে সে 'A' ক্লাস লাইসেন্স পেয়ে গেল। রণজিতের কী আনন্দ ইরার এই সাফল্যে! কিন্তু তখন কি রণজিত ভেবেছিল ইরার এই আকাশে ওড়ার আকাঙ্ক্ষা অতদূর বেড়ে যাবে। সে ভেবেছিল, দু-এক ঘণ্টা উড়বে সে মাঝে মাঝে নিছক আমোদের জন্যে। কিন্তু সেই ইরা যে আজ হঠাৎ ছোট্ট মেয়ের মত বায়না ধরে বসবে তার সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার পথে সহযাত্রী হওয়ার জন্যে, একথা সে জন্মেও কোনদিন ভাবতে পারে নি। ইরা কিন্তু আজ মরীয়া হয়ে উঠেছে—সে যাবেই রণজিতের সঙ্গে ওর

লাইট-প্লেনে চড়ে, অস্ট্রেলিয়া অভিযানে। আজ তার মনে হচ্ছে, সে যদি ঐ বঙ্গোপসাগর পার হয়ে ভারত মহাসাগরের উপর দিয়ে উড়ে অস্ট্রেলিয়ায় যেতে না পারে তাহলে তার জীবনই বৃথা; তাহলে এ ব্যর্থ জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে তার মরণই শ্রেয়। মায়ের চোখের জল, বাপের তিরস্কার, আত্মীয়-স্বজনের উপদেশ—কিছুতেই তাকে নিরুৎসাহ করতে পারে নি। এমন কি এতদিন অন্যান্য সকলের মতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যে তাকে সমানে উৎসাহ দিয়ে এসেছে, সেই রণজিতই তাকে কত বুঝিয়েছে, তার সঙ্গে কত তর্ক করেছে!

বোঝাতে বোঝাতে রণজিত একটু বিরক্ত হয়েই বললে সেদিন—"দেখ ইরা, সমস্ত কিছুরই একটা সীমা আছে। সীমা ছাড়িয়ে যারা চলতে চায় তাদের ধ্বংস সুনিশ্চিত। হাজার হলেও তুই মেয়েমানুষ—সেটা ভুলে যাচ্ছিস কেন? মেয়েরা কে কবে এতদূর উঠেছে বল্ তো এরোপ্লেন চড়ে? যা কোনও দেশের কোনও মেয়ে কখনও—"

রণজিতের কথায় বাধা দিয়ে ইরা বললে, "দেখ ছোড়দা, আমাকে যা-তা বোঝাবার চেষ্টা করো না। কে না জানে, ওদের দেশে কত মেয়ে লম্বা লম্বা পাড়ি দিচ্ছে এরোপ্লেনে। ১৯০৯ সনে, তখন তুমিও জন্মাওনি আমিও না, যখন এরোপ্লেনে চড়া এরকম ছেলেখেলা ছিল না, এরোপ্লেন চড়া মানেই যখন ছিল প্রাণ নিয়ে টানাটানি—তখনই ফ্রান্সের এক মহিলা এরোপ্লেনে চড়ে আকাশে ওড়েন। সেই থেকেই চলে আসছে আকাশের বুকে মেয়েদের এই অভিযান।"—একটু থেমেই আবার বললে,—"মিস কীথ মিলারের নাম শুনেছ নিশ্চয়? ১৯২৭ সনেই বোধহয় তিনি ক্যাপ্টেন ল্যাঙ্কাস্টারকে সঙ্গে নিয়ে ইংল্যাণ্ড থেকে অস্ট্রেলিয়ায় পৌছোন, আর এ সামান্য কলকাতা থেকে অস্ট্রেলিয়া।"

রণজিত বললে, "মিস কীথ মিলারের নাম নিশ্চয়ই জানি। কিন্তু তাঁকে কী বিপদে পড়তে হয়েছিল মনে আছে তো? তাঁদের যন্ত্রটি দু-দু'বার গেছল বিগড়ে; তা ছাড়া আকাশের অবস্থাও তাঁদের কম বিপদে ফেলেনি। পাক্কা পাচটি মাস লেগেছিল তাঁদের ইংল্যাণ্ড থেকে অস্ট্রেলিয়া পৌছতে। কিন্তু তোমার তো পাঁচ মাস কাটালে চলবে না, ওদিকে যে বি. এ. পরীক্ষা সামনে। সেদিকেও লক্ষ্য রাখা চাই যাতে ফার্স্টক্লাসটি না ফসকায়—ইংরেজি অনার্সে।"

ইরা হেসে বললে,—"মিস কীথ মিলারের পরেও বহু মেয়ে উড়েছে আকাশে। এই তো সেদিন, ১৯৩৪ সনে জীন ব্যাটেন—নিউজিল্যাণ্ডের একটি মেয়ে চৌদ্দ ঘণ্টায় পৌঁচেছে ইংল্যাণ্ড থেকে অস্ট্রেলিয়ায়। যাদেরই পাইলটিং সম্বন্ধে একটু ইণ্টারেস্ট আছে, তারাই আজ জীন ব্যাটেনের নাম জানে। তাছাড়া মিস এমিলিয়া ইয়ারহার্ট, পরে তিনি হন মিসেস পাট্‌নাম্—১৯৩২ সনে আটলাণ্টিক ক্রস করে পুরুষদের তো মাথা নীচু করে দিয়েছেনই,—তাঁর জয়ধ্বনিতে তো সারা জগৎ ছেয়ে গেছে! তবে? অবশ্য আমি বাঙালী মেয়ে এই যা অপরাধ আমার।"

রণজিত হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে। হতভাগা মেয়েটা যে পড়াশুনাও করে দারুণ! ত্রিসংসারে এমন কোন খবর নেই যা ও জানে না। শেষ পর্যন্ত রণজিত বাধ্য হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে।

কিন্তু এবারে বেঁকে দাঁড়িয়েছেন রণজিতের বাবা এবং মা, সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ভাইয়েরাও। ইরাও জিদ ধরেছে যে, হয় তাকে রণজিতের সঙ্গে এরোপ্লেনে অস্ট্রেলিয়ায় যেতে অনুমতি দেওয়া হোক, নয়ত সে জলস্পর্শ করবে না—মৃত্যুপণ তার। এ মেয়ে যেন একাধারে হিটলার আর মহাত্মা গান্ধী।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ইরারই জয় হল—তার অনশন ব্রত বন্ধ করবার জন্যে তার বাবা ও মাকে মত দিতে হল শেষ পর্যন্ত।

ইরার যে কী দুর্দমনীয় আনন্দ! মাত্র আর পাঁচটি দিন বাদে সে উড়বে আকাশের বুকে,—তার পরম প্রিয় ছোড়দা চালাবে তার লাইট প্লেনখানি, আর তার পাশে থাকবে ইরা স্বয়ং। সে নিজেও একটু চালাবে নিশ্চয়; ছোড়দাকে একটু আব্দার করে ধরলেই ছোড়দা রাজি হবে। অত আদরের ছোট বোন সে!

সেদিন সন্ধ্যায় দুই ভাই বোন বার হয়েছে মোটরে। ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে চলেছে গাড়ী। ইরার হাতে স্টিয়ারিং। রণজিত একটা সিগারেট ধরিয়ে আরামে টানছে চোখ বুজে, এমন সময় ইরা একটু মিষ্টি হেসে বললে,—"ছোড়দা, আমাকে চালাতে দেবে তো তোমার প্লেনটি?"

রণজিত আশ্চর্য হয়ে বললে, "বলিস্ কি রে? তোর হাতে প্লেন ছেড়ে দেব, যঁ্যা? আমি তো আর বেড়াতে যাচ্ছি না, যাচ্ছি একটা স্পীডের রেকর্ড করব বলে। কাজেই সামনে আমাকেই চালাতে হবে। তা ছাড়া এই লম্বা পাড়ি সমুদ্রের ওপর দিয়ে—সোজা কথা, তুই কি পাগল হয়েছিস?"

ইরা বললে—"বা-রে, চালাতে যদি না পারি তাহলে এত কাণ্ড করে চলেছি কেন তোমার সঙ্গে? শুধু এরোপ্লেন চড়াই আমার উদ্দেশ্য নাকি? ছিঃ ছোড়দা, তোমার পাইলট বোনটিকে এ রকম করে অপমান করো না। পাঁচ-দশ টাকা দিয়ে দমদমে মোটা, রোগা, বাচ্চা, বুড়ী,—বাঙালী, আবাঙালী যেসব ছেলেমেয়েরা দশ-পনেরো মিনিটের জন্যে এরোপ্লেনে চড়ে দু'শো-তিনশো গজ উপরে উঠে একটু ঘুরে নেমে এসে বলে—উঃ, আকাশে ঘুরে এলাম!—তাদের দলে আমাকে ফেলছ নাকি? হয়ত মিস কীথ মিলার বা মিস জীন ব্যাটেন না হতে পারি কিন্তু তা বলে একেবারে থেঁদি-পেঁচিও নই।"

রণজিত একটু হেসে বললে, "আচ্ছা আচ্ছা, আগে 'B' ক্লাস লাইসেন্স নিয়ে আয় বিলেত থেকে, তারপর দেব তোর হাতে আমার প্লেন ছেড়ে।"

ইরা শুনল না কিছুতেই। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, দমদম থেকে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত চালাবে ইরা সিঙ্গাপুর থেকে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে যাবে রণজিত। ফিরবার পথে রণজিত একবার চেষ্টা করবে রেকর্ড করবার।

ইরার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব মহলে একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। ইরার 'অনারে' একটা টী-পার্টিরই আয়োজন করে ফেলল সবাই।

পাঁচটা দিন কেটে গেল কোথা দিয়ে। যাওয়ার দিন ও ক্ষণ এগিয়ে এল।

এরোড্রোম সেদিন লোকে লোকারণ্য। ফ্লাই ক্লাবের মেম্বাররা রণজিতের গলায় আর ইরার গলায় মালা পরিয়ে দিলেন। ইরার বন্ধুরাও দিল ইরার গলায় মালা পরিয়ে। পাইলটবেশী ইরাকে মালা গলায় কী সুন্দর যে দেখাচ্ছিল তখন তা বলা যায় না। রণজিত তার বাপ-মাকে প্রণাম করে ইরার বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে তার ক্লাবের মেম্বারদের দিকে এগিয়ে গেল। ইরা তার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে তার মা আর বাবার কাছে গেল। বিজয়বাবু কন্যাকে রুদ্ধকণ্ঠে করলেন আশীর্বাদ, আর ইরার মা ইরাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন। চোখ দুটি তাঁর জলে ভরে উঠল। জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে বললেন,—"এসো মা, তোমার সাধ পুর্ণ করে শীগ্‌গির ফিরে এসো তোমার মায়ের বুকে।"

ইরা হেসে বললে,—"ক'টা দিন পরেই তো ফিরছি মা। তারপর রোজ রাতে তোমার বুকের মধ্যে শুয়ে শুয়ে ছোট্ট শান্ত মেয়েটির মত অস্ট্রেলিয়ার গল্প করব।"

সকলের আনন্দ ও উৎসাহধ্বনির মধ্যে রণজিত আর ইরা ধীরে ধীরে আকাশের বুকে উড়ে গেল। দেখতে দেখতে ওদের হালকা প্লেনখানি ঊর্ধ্বে উঠতে উঠতে ক্রমশঃ মেঘের আড়ালে কোথায় লুকিয়ে গেল।

সকলের চোখে ফুটে উঠেছে বিস্ময়ের আভাস। ইরার মায়ের মনটা কেবল কি যেন একটা আশঙ্কায় ভরে উঠতে লাগল। চোখ বুজে তিনি শুধু নিজের মনেই বললেন,—"নারায়ণ, ভালোয় ভালোয় ফিরে আসে যেন আমার ইরা আর রাণু—"

• • • •

কয়দিন গেছে কেটে। ইরার মায়ের মনের সেদিনের সেই অজানা আশঙ্কা আজ রূপ নিয়েছে। বিজয়বাবুর বাড়ীতে আজ এক বিষাদের ঘন ছায়া ছেয়ে আছে চারিধারে। সকলেই যেন মুষড়ে পড়েছে কি একটা অজানা বিপদের আশঙ্কায়। ইরার মা তো আজ ক'দিন জলস্পর্শই করেননি,—কেঁদে কেঁদে তাঁর চোখ দুটি ফুলে উঠেছে। ক'দিন হয়ে গেল রণজিত আর ইরা গেছে। রেঙ্গুন এবং সিঙ্গাপুর থেকে পর পর দু'খানি টেলিগ্রাম করেছে রণজিত এই বলে যে তারা পৌঁছেছে এবং দু'জনেই ভাল আছে। সিঙ্গাপুর থেকে যে শেষ টেলিগ্রাম করেছে তাতে লিখেছে—"অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছেই তোমাদের 'তার' করব, আর তার পরেই লিখব এক বিরাট চিঠি—আমি আর ইরা। আমরা এখনি আবার ছাড়ছি সিঙ্গাপুর।" ব্যস, এই শেষ খবর। তারপর আজ পনেরো দিন কেটে গেল—না এসেছে টেলিগ্রাম না এসেছে চিঠি, কোনো খবরই আর নেই ওদের দু'জনার।

রণজিতের ফ্লাইং-ক্লাবের মেম্বার—রণজিতের পরম প্রিয় বন্ধু অজয় এসে বললে সেদিন রণজিতের মাকে—"কাকীমা, আপনি অত কাতর হবেন না ভেবে ভেবে; আমি যাচ্ছি আজই এরোপ্লেনে চড়ে, ওদের খোঁজ নিয়ে ফিরছি দু'-একদিনের মধ্যেই, দেখুন না সঙ্গে করেই নিয়ে আসব ওদের।"

রণজিতের মা চোখের জল মুছে বললেন, "বাবা, আমার ত সর্বনাশ হয়েছেই, তুমি পরের বাছা; তুমি কেন আবার ঐ সর্বনাশের যন্তরে চেপে তোমার প্রাণটা খোয়াবে?"

অজয় হেসে বললে, "কাকীমা, ভয় নেই, আমি মরলে আমার জন্যে কেউ কাঁদবার নেই। ত্রিসংসারে আমার এক বুড়ী পিসিমা আছেন অবশিষ্ট—সে বুড়ীই বা আর ক'দিন। চললাম তাহলে—বলে রণজিতের মায়ের পায়ের ধূলো নিয়ে অজয় বিদায় নিল।

অজয় সেইদিনই রওনা হল সিঙ্গাপুর অভিমুখে।

দিনের পর দিন যায়—সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে, কবে ফিরে আসে অজয়। এক একটি মুহূর্ত যেন এক একটি যুগ বলে মনে হয়। সন্দেহ-দোলায় দুলতে থাকে সকলের মন—আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব চলতে থাকে সকলেরই বুকের মধ্যে। কী সংবাদ নিয়ে ফিরবে অজয় কে জানে? ওদের যদি সঙ্গে করেই ফিরে আসে, সত্যি!—কিংবা? সে কথা ভাবতেও যে সকলের বুকের মধ্যেটা কি রকম মুচড়ে উঠে!

কিছুদিন পরে ফিরল অজয় শেষ পর্যন্ত, কিন্তু কোনও বিশেষ খবরই আনতে পারেনি সে রণজিতের। রণজিতের মা অশ্রুসজল কণ্ঠে শুধু একটি কথা জিজ্ঞাসা করলেন—"কোন খবরই পেলে না ওদের, বাবা?"



অজয় বললে, "সিঙ্গাপুরে গিয়ে শুধু এইটুকু খবর পেয়েছে যে তারা সিঙ্গাপুরে পৌছেছিল ঠিকই, কিন্তু সিঙ্গাপুর থেকে তারা চলে গেছে প্লেন উড়িয়ে—বেশ সুস্থ শরীরেই।"

অজয় তারপর ওদের খোঁজে সিঙ্গাপুর থেকে গেছে অস্ট্রেলিয়ায়। সেখানে পৌছে, সেখানকার এরোড্রোমে, হোটেলে, হাসপাতালে—সর্বত্র খোঁজ করে

দেখেছে, কোথাও তাদের দেখা মেলেনি। তাদের ত দেখা মেলেইনি, তাদের প্লেনখানিরও না।

অজয় ভেবেছিল যে যদি ওরা কোনওক্রমে পৌঁছে থাকে ওখানে, তাহলে ওদের খুঁজে না পাক, ওদের 'লাইট প্লেন্'খানিকে খুঁজে বার করা শক্ত হবে না। এও ভেবেছিল সে যে হয়ত নামবার সময় ধাক্কা লেগে এরোপ্লেনটি ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, কারণ, এ বিপদ এবং দুর্ভাগ্য বহু পাইলটের অদৃষ্টে প্রায়ই ঘটে থাকে। কিন্তু ওর নিশ্চিত ধারণা ছিল যে, যদি প্লেনখানি ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েও থাকে তাহলেও ভাঙা অংশগুলির অন্ততপক্ষে দু' একটাও নিশ্চয় ওর চোখে পড়বে।···কিন্তু কিছুই সে দেখতে পেল না তার প্রিয়তম বন্ধুর আর তার ছোট বোনটির। অজয়ের নিজের দুঃখ যাই হোক, বুকটা তার ব্যথায় রণিয়ে উঠল যখন তাকে এসে রণজিতের প্রিয় ও আপনার জনদের খবর দিতে হল যে রণজিত আর ইরা এরোপ্লেনে চড়ে সিঙ্গাপুর থেকে বেরিয়েছিল অস্ট্রেলিয়ায় যাবার উদ্দেশ্যে কিন্তু অস্ট্রেলিয়ায় তারা পৌঁছায়নি।

মুষড়ে পড়ল সবাই, একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন রণজিতের মা। সকলেরই চোখ ফেটে জল এল যখন তিনি বহুক্ষণ গুমরে থেকে আর্তনাদ করে কেঁদে উঠলেন—"মাগো, কথা রাখতে পারলিনে! বলে গেলি যে ক'দিনের মধ্যেই ফিরে এসে তোর মায়ের বুকের মধ্যে শুয়ে ছোট্ট মেয়ের মত গল্প করবি অস্ট্রেলিয়ার, কই ফিরে এলিনে ত মা?"

অজয় ভেবে ঠিক করতে পারলে না যে কী হল রণজিতের। ভারত মহাসাগরের উপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় নিশ্চয়ই কোনও দুর্ভাগ্য ঘটেছে ওদের অদৃষ্টে। হয়ত ওদের সলিল-সমাধি হয়েছে, নয়ত কোনও স্থলভূমিতে ওদের মৃতদেহ পড়ে আছে, শেয়াল কুকুরে সে মৃতদেহগুলিকে খাচ্ছে টেনে টেনে, কিংবা হযত এমন কোনও জায়গায় গিয়ে পড়েছে ওরা যেখান থেকে উদ্ধারের কোন আশাই আর ওরা দেখতে পাচ্ছে না।

অজয়ের আপনার বলতে এ সংসারে বিশেষ কেউই ছিল না। তাই সে বাইরের দু'একজনকে তার জীবনে অতি আপন করে কাছে টেনে নিয়েছিল—নিজে থেকেই। রণজিত আবার সেই দু'একজনের মধ্যেই বিশেষ একজন; সমস্ত প্রাণমন দিয়ে সে ভালবাসত তার এই বন্ধুটিকে। তাই তাকে হারিয়ে অজয়ের কাছে সমস্ত সংসারই আজ একেবারে শূন্য মনে হতে লাগল।

অজয়ের অর্থের অভাব ছিল না। বিপুল সম্পত্তি তার বাবা রেখে গেছেন তার জন্যে। সে ঠিক করলে যে একটা জাহাজ সে ভাড়া করবে—দিনের পর দিন সে খুঁজবে তার প্রিয়তম বন্ধুকে আর বন্ধুর পরম আদরের বোনটিকে। যতদিন তার হাতে এক কপর্দকও থাকবে,—যতদিন সে সত্যিই একেবারে নিরাশ না হয়ে পড়বে ততদিন সে ঘুরবে প্রতি সাগর মহাসাগরের বুকে বুকে, খুঁজবে প্রতি কূল উপকূল। সকলের কাছে বিদায় নিয়ে বার হয়ে পড়ল সে তার কয়েকটি অনুচর সঙ্গে নিয়ে। ভাসল অসীম সমুদ্রের বুকে অনির্দিষ্ট ভাবে,—তার পরম প্রিয় বন্ধুর খোঁজে।

এক বৎসর পরের কথা। রণজিতদের বাড়ীর বসবার ঘরে সেদিন সন্ধ্যায় অনেকেই উপস্থিত। সবাই নীরব—নতুন কি একটা দারুণ দুঃসংবাদে সকলেই যেন বাক্যহারা। অনেকক্ষণ পরে সে নীরবতা ভঙ্গ করলে রণজিতের ছোটকাকার মেয়ে মীরা। মীরা বললে অতি আস্তে—"আচ্ছা, যে জাহাজটি ডুবেছে জলের মধ্যেকার পাহাড়ে ধাক্কা লেগে সেটা যে অজুদারই জাহাজ, তা তোমরা সঠিক বলে ধরে নিচ্ছ কেন? এও ত হতে পারে যে, সে জাহাজটি কোনও মালবাহী জাহাজ বা প্যাসেঞ্জার জাহাজ?"

রণজিতের বাবা বিজয়বাবু বললেন—"না মা, তা হতে পারে না। কোনও কোম্পানির কোনও মালবাহী জাহাজ বা প্যাসেঞ্জার জাহাজ যায়নি ডুবে। তাহলে আজ এই কয়দিনের মধ্যে তারা কি সে খবর পেত না? তা ছাড়া সবচেয়ে বেশী প্রমাণ হচ্ছে আজকের কাগজের বিবরণ। দেখছিস না কাগজে লিখছে—'জাহাজখানি যে কার তা আজ পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে না। যেখানে জাহাজ ডুবেছে সেখানে কোন জাহাজেরই যাওয়ার উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না—কারণ, একেবারে সমস্ত রুট-এর বাইরে এ জায়গা—কি উদ্দেশ্যেই বা এ জাহাজখানি এখানে এসেছিল বোঝা দুষ্কর।'"

রণজিতের মেজদা বললেন, "বোঝা ওদের পক্ষে দুষ্কর, কিন্তু আমরা বেশ বুঝেছি যে কি উদ্দেশ্যে ও জাহাজ ওখানে গিয়েছিল।" একটু থেমে আবার বললেন—"অজয়ের প্রাণটাও শেষ পর্যন্ত এমনি করে গেল! এই বয়স—অত বড়লোকের ছেলে—জীবনের কিছুই উপভোগ করতে পেল না।"

রণজিতের বড় পিসিমার মেয়ে ললিতা বললে,—"অজয়ের সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধ আছে এমন লোক হয়ত বেশী নেই সংসারে, কিন্তু হৃদয়ের সম্পর্ক

আছে অজয়ের সঙ্গে—অজয়কে প্রাণমন দিয়ে স্নেহ করে, ভালবাসে এমন লোকের ত অভাব নেই। জীবনের শেষ মুহূর্তে সেসব লোকের একটিরও মুখ সে দেখতে পেলনা—এ কি কম দুঃখের কথা ?”

রণজিতের মা আজকাল বেশী কথা বলতেন না কারো সঙ্গেই। আজ এ ঘরে যদিও তিনি বসেছিলেন কিন্তু একটি কথাও এতক্ষণ তিনি বলেন নি। চোখ দিয়ে তাঁর শুধু মাঝে মাঝে দু'এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ছিল। অজয় তাঁর কাছে নিজের সন্তানের চেয়ে কোনও অংশে কম ছিল না। রণজিত আর ইরার শোক যেন আজ তাঁর অন্তরে আবার নতুন করে জেগে উঠেছে। তিনি শুধু বললেন এতক্ষণ পরে—“আমারই জন্যে অজয় তার অমূল্য প্রাণটা বিসর্জন দিল। আমারই কাতরতা দেখে”—তিনি আর বলতে পারলেন না, কণ্ঠ তাঁর রুদ্ধ হয়ে এল কান্নায়।

রণজিতের বাবা বললেন, “সে শুধু তোমারই দুঃখে কাতর হয়ে ভেসেছিল অসীম পাথারে অনির্দিষ্ট ভাবে—একথা ভেবনা। তার নিজের দুঃখটা আমাদের কারো চেয়ে, এমন কি বোধহয় তোমার চেয়েও কম ছিল না। ও যে কত বড় চাপা ছেলে সে তোমরা কেউ জান না। বাল্যে ও হারিয়েছিল ওর মাকে; তাই সতীশ, আমার পরম বন্ধু সতীশ—অজুর বাবা, অজুকে বুকে করে মানুষ করে তুলেছিল। অজু যে তার বাবাকে কতখানি ভালবাসত সে তোমরা কল্পনাও করতে পার না। সেই বাবা যখন ওর মারা গেল হঠাৎ নিউমোনিয়া হয়ে দুটি দিনের মধ্যে, তখনও ওর চোখে এক ফোঁটা জল কেউ দেখতে পায়নি। অথচ যেদিন ও ফিরে এল অস্ট্রেলিয়া থেকে রণু আর ইরার কোনও খবর না পেয়ে, সেদিন ওর সে মূর্তি দেখে—আমি বাবা, আমি আমার ছেলেমেয়ের শোক ওর ও শোকের কাছে কিছুই নয় ভাবলাম। কোনও দিন যা দেখিনি সেইদিন তাই দেখলাম—ওর চোখের কোণে দু'ফোঁটা অশ্রু টল টল করছে।”

মীরা যেন নিজের মনেই বললে,—“বন্ধুর ভালবাসা এত গভীর, এত নিঃস্বার্থ হয় তা আগে জানতাম না।”

ললিতা বললে—“অজয়ের পিসিমা এই এক বৎসর ত এক রকম না খেয়ে আর কেঁদে কেঁদে শয্যাশায়ী হয়েছেন—এইবার এ খবর পেলে নিশ্চয়ই তিনি মারা যাবেন।”

রণজিতের মেজদা বললেন--"তাঁর আর এখন বেঁচে থেকে লাভ কী, অজয়ই যখন আর রইল না! এ সংসারে"—

ঘরের কোণে টেলিফোনটা হঠাৎ বেজে উঠল। মীরা অতি অন্যমনস্কভাবে উঠে গিয়ে ফোনের রিসিভারটা তুলে নিল। কানের কাছে সেটা ধরে বললে, "হ্যালো?"

মীরা হঠাৎ ভীষণ চমকে উঠল—সে তার নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না। সে কম্পিত কণ্ঠে আবার জিজ্ঞাসা করলে—"হ্যালো—কে আপনি?"

উত্তর শুনে এবার মীরা চীৎকার করে উঠল—"অজয়দা—অজুদা ফোন করছে—সে বেঁচে আছে! তোমাকে ডাকছে জ্যাঠামণি!"

সকলেই উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল ভীষণ। বিজয়বাবু মীরার হাত থেকে ফোনের রিসিভারটা নিজে নিয়ে নিলেন। বললেন—"কে, অজয়?" গলার স্বর তখন তাঁর কাঁপছে উত্তেজনায়। অজয় বেঁচে আছে—হয়ত রণু ইরাও আছে, বেঁচে—হয়ত ও তাদের সঙ্গে করে এনেছে, অন্ততপক্ষে খবরও এনেছে।

উত্তর এল—"হ্যাঁ, আমি অজয়।"

বড়ই ক্লান্ত যেন অজয়ের স্বর,—যেন আর কে কথা কইছে, ওর স্বর যেন চেনাই যায় না। বিজয়বাবু আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার জাহাজ তাহলে ডোবেনি?"

অজয় বললে, "না, সে আমার জাহাজ নয়।"

বিজয়বাবু কোনও রকমে জিজ্ঞাসা করলেন, "রণু আর ইরার খবর পেয়েছ কিছু?"

অজয় বললে, "হ্যাঁ পেয়েছি।"

বিজয়বাবুর শরীর তখন থর থর করে কাঁপছে, জিজ্ঞাসা করলেন অতি ক্ষীণস্বরে, "বেঁচে আছে ত ওরা?"

অজয় অতি ম্লান স্বরে উত্তর দিল—"হ্যাঁ, বেঁচে আছে, কিন্তু—"

বিজয়বাবু ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"কিন্তু কি?"

অজয় বললে—"আমি যাচ্ছি আপনাদের ওখানে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে। গিয়ে সব বলব।"

এক অজানা আশঙ্কায় ভরে উঠল সকলের মন। সারা ঘরটায় যেন এক অস্বাভাবিক নীরবতা নেমে এল কোথা থেকে।

তিন

যে বিরাট নীরবতা নেমেছিল রণজিতেদের বসবার ঘরে, বহুক্ষণ পরে সে নীরবতা ভাঙ্গল ওদের বাড়ীর বাইরে একটা মোটর রাখার শব্দে।

সকলেই ভীষণ উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল। মীরা উঠে গিয়ে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল, সত্যিই তাদের বাড়ীর সম্মুখে একখানি প্রকাণ্ড মোটর এসে থেমেছে। মোটর থেকে নামলেন একটি ভদ্রলোক ; একটু এগিয়ে আসতেই মুখে রাস্তার গ্যাসের আলো এসে পড়ল। মীরা সেই আলোতে তাঁর মুখটা স্পষ্ট দেখতে পেল, পেয়ে সে শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাঃস ছেড়ে বললে—"না অজুদা নয়।"—বলে সে ধীরে ধীরে এসে আবার নিজের জায়গায় বসল···

কিন্তু, আশ্চর্য! সেই ভদ্রলোকটিই যে সটান তাদের বাড়ীর ভিতর ঢুকে হল ঘরের ভিতর দিয়ে বসবার ঘরের দিকে আসছেন।

ভদ্রলোক আসতেই সকলের মধ্যেই একটা চাঞ্চল্য প্রকাশ পেল—একজন অচেনা লোক, কিছু না বলে-কয়ে সোজা একেবারে বাড়ীর মধ্যে।

বিজয় বাবু একটু গম্ভীর ভাবেই জিজ্ঞাসা করলেন—"কী দরকার আপনার? কাকে চাই?"

ক্লান্তস্বরে উত্তর এল—"কাকাবাবু, আমি অজু—"

এক তীব্র বিস্ময়ে সকলে একেবারে নির্বাক হয়ে গেল। খানিকক্ষণের জন্য সকলে বিস্ময়ে চেয়ে রইল অজয়ের মুখের দিকে—মনে হল সকলে যেন একেবারে পাথরে পরিণত হয়ে গেছে।

আশ্চর্য পরিবর্তন এ যে অসম্ভবেরও বেশী কিছু! অজয়ের সে স্বাস্থ্য কোথায়? সে সৌন্দর্য কোথায়? তার সে সুন্দর গঠিত চেহারা একেবারে শীর্ণ হয়ে গেছে গায়ের রং গেছে কালো হয়ে, গাল দুটি বসে গেছে, চোখের দৃষ্টি গেছে কি রকম নিষ্প্রভ হয়ে ; সমস্ত কপালে পড়েছে অসংখ্য চিন্তার রেখা। কতদিন যে সে কামায়নি—কতদিন যে তার চুলে পড়েনি তেল—তা কে বলবে!

বিস্ময়ের ঘোর একটু কেটে যেতেই বিজয়বাবু অস্ফুটস্বরে বললেন, "অজু, এ রকম চেহারা হয়ে গেছে কী করে তোমার? এ যে কল্পনার অতীত!"

ভুলে গেলেন তিনি রণজিত আর ইরার কথা জিজ্ঞাসা করতে, যার জন্যে সকলেই এতক্ষণ ছিল উদ্‌গ্রীব হয়ে।

অজয় একটু ম্লান হেসে বললে, "অসুখ করেছিল কাকাবাবু, তা ছাড়া জাহাজে ঘুরেছি সমানে, কাজেই—" বলে মীরার দিকে তাকিয়ে বললে, "বোনটি আমাকে এক কাপ চা করে দাও না!" বলে, বসল সে সামনের একটা কৌচে এতক্ষণ পরে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই মীরা এক কাপ গরম চা তৈরি করে এনে দিল।

অজয় চায়ের কাপটি শেষ করে মাটির দিকে তাকিয়ে খাণিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। কেউই আর সাহস পেল না অজয়কে রণজিত আর ইরার কথা জিজ্ঞাসা করতে।

অজয় একটু পরে নিজে থেকেই শুরু করলে,—

"অনেকখানি আশা মনের মধ্যে নিয়েই সেদিন এখান থেকে জাহাজ ছাড়ি। ভেবেছিলাম দেখা ওদের মিলবেই। দিনের পর দিন তাই ঘুরলাম প্রত্যেক দ্বীপে উপদ্বীপে। প্রত্যেক জায়গায় নেমে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি ওদের—কিন্তু কোনও খোঁজই পাইনি। প্রথমটায় একটা প্ল্যান করে ম্যাপ দেখে ঘুরছিলাম। কিন্তু, যতই নিরাশ হতে লাগলাম ততই আমার নির্দিষ্ট পথে চলা কমে আসতে লাগল। শেষ পর্যন্ত তাই জাহাজটি চালানো হতে লাগল অনির্দিষ্টভাবে—কখনও পূর্বে, কখনও পশ্চিমে, কখনও উত্তরে কখনও বা দক্ষিণে। যেখানেই কোনও স্থল পাই সেখানেই জাহাজ লাগাই। সে যে কোন্ জায়গা তার কোনও ঠিক নেই—শুধু খোঁজা আর খোঁজা! এমনিভাবে কাটল কতদিন কে জানে—দিনরাত্রির হিসেব ত রাখতাম না। একদিন একটা দ্বীপ দেখতে পেলাম দূর থেকে; অভ্যাসবশতঃ সেটার কাছেও জাহাজ বাঁধলাম, নৌকো নামিয়ে পৌছুলাম দ্বীপটিতে। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেলাম,—বুকটা নেচে উঠল আনন্দে—মহা আনন্দে। হয়ত এতদিন পরে ওদের দেখা মিলল! ঐ রণজিতের লাইট প্লেনখানি রয়েছে পড়ে—ভেঙ্গে গেছে কিন্তু চুরমার হয়নি। এগিয়ে গেলাম একেবারে এরোপ্লেনটির কাছে। কাকেও দেখতে পেলাম না, চীৎকার করে ডাকলাম—'রণু, ইরা!'—কোনও উত্তর পেলাম না। ভাবলাম কি হল! কোনও বিপদ ঘটেনি ত ওদের! কোনও বন্য জন্তু—! কিন্তু সে ভাবনা তক্ষণি গেল চলে কারণ কাছে দেখলাম—রণজিতের আর ইরার পাইলটের পোশাক রয়েছে খোলা—এমন কি ওরা যে খাওয়া-দাওয়া করেছে ওখানে তারও যথেষ্ট চিহ্নই বর্তমান রয়েছে সেখানে। ইরার আর রণজিতের রাতের কাপড়-চোপড় পর্যন্ত রয়েছে

ছাড়া এরোপ্লেনটার মধ্যে। মনে করলাম, নিশ্চয়ই গেছে কোথায়—হয়ত আহারের খোঁজে, কিংবা অন্য কোনও প্রয়োজনে—এক্ষুণি আসবে ওরা। এক ঘণ্টা কেটে গেল, দু'ঘণ্টা কেটে গেল, তিন ঘণ্টা কেটে চার ঘণ্টা কাটতে চলল। মনটা আবার এক আজানা আশঙ্কায় ভরে উঠল। ব্যাকুল হয়ে চারিদিকে তাকাতে লাগলাম; হঠাৎ দেখি, যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম তার কাছেই, এরোপ্লেনের উপরে রয়েছে একটা ডায়েরী পড়ে। তুলে নিলাম সেটা; সেটার প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত শুধু তাড়াতাড়ি উলটে গেলাম একবার। শেষ পাতায় দেখি লেখা রয়েছে—'যদি কোনও দিন আমার আপনার কেউ আসে এখানে তারই জন্য রেখে গেলাম ডায়েরীর এই ক'খানি পাতা—'

"এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললাম সমস্ত ডায়েরীটা। তার পরে যে কতবার পড়েছি তা বলতে পারি না।"

একটু থেমে অজয় বললে, "ফিরবার সময় কোথায় যে সে ডায়েরীটা গেল কিছুতেই তা ঠিক করতে পারলাম না। যতখানি মনে আছে ততখানিই বলছি, রুণুরই ভাষায়—

..."শত আনন্দ-কোলাহল ও বিদায় অশ্রুর মধ্যে উড়ল আমাদের প্লেনখানি, ইরার হাতে প্লেন-কণ্ট্রোলের ভার। সেদিন তখন ইরার মুখে সে কী উত্তেজনা আর কী খুশীর রঙই না লেগেছে! মনটা আমারও গান গেয়ে উঠল আনন্দে। আমার কত আদরের বোনটি, তার সে আনন্দোজ্জ্বল মুখ দেখে ভুলে গেলাম নিজের স্পীডের রেকর্ড করবার কথা। ঠিক করলাম, এবার এমনি যাই—আসি বেড়িয়ে, দু'চারটে দেশ দেখে। নতুন নতুন এরোড্রোমে তা হলে নামবে আমাদের প্লেনখানি, নতুন নতুন এরোড্রোমে থেকে আবার উড়বে সেটি। ইরার খুশির তা হলে আর অন্ত থাকবে না —নিজের জীবনকেও ধন্য বলে মানবে। এর পরের বার আমি না-হয় আসব একা,—স্পীডের রেকর্ড করতে।

"অত আনন্দের মধ্যে তখন ভুলে গিয়েছিলাম যে আলোর পিছনেই লুকিয়ে থাকে অন্ধকার, আনন্দের পিছনেই থাকে বিপদের সম্ভাবনা।

"কিছুদূর যাওয়ার পর হঠাৎ প্রকাণ্ড কি একটা উড়ে এল প্লেনটির সামনে। প্লেনটির প্রোপেলারের সঙ্গে ধাক্কাও লাগল সামান্য। প্লেনটা গেল কাৎ হয়ে— ইরা কোনওরকমে সামলে নিল বটে, কিন্তু ভয়ে তার মুখ তখন পাংশু হয়ে

গেছে। সে ত কোনও দিন এ রকম লম্বা পাড়ি দেয়নি, কি জানবে সে এ বিপদের কথা! এ বিপদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে আমার যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে! চমকে উঠলাম আমি। সর্বনাশ, মনে হল ঈগলের মত কি একটা প্রকাণ্ড পাখী প্লেনখানির পাশ দিয়ে উড়ে গেল আবার সামনের দিকে। ভারতের যে কোনও বিমানচারীই যে এ বিপদকে দারুণ ভয় করে! কত এরোপ্লেনের প্রপেলার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে বড় বড় শকুনি বা ঈগলের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে, কত প্রপেলার বেঁকে দুমড়ে গেছে!

"পাখীটা তারই শত্রু ভেবেছে আমাদের প্লেনখানিকে—ভয় পেয়ে তাই আক্রমণ করেছে হয়ত। ইরার সে দিশেহারা মূর্তি এখনও মনে পড়ে। এই বিপদে একটি মাত্র উদ্ধারের উপায় আছে। তাই নলের মধ্যে দিয়ে ইরার কানে বললাম—"ইরা, শীগ্‌গির প্লেনটাকে আরও অনেক উপরের লেভেলে তোল্"—কারণ, ঐ সব বৃহদাকার পাখীগুলো যখন ভয় পায় তখন ওরা নীচের দিকে নেমে আসে সজোরে। ইরা মুহূর্তের মধ্যে প্লেনখানিকে দু'শ' তিনশ' ফুট উঁচুতে তুলে ফেলল। পাখীটাকে এবার আর দেখা গেল না।

"আমি ভয় পেলাম এই ভেবে, ইরা বোধহয় এর পর আর কন্‌ট্রোল করতে পারবে না এরোপ্লেনটিকে। কিন্তু আশ্চর্য ওর মনের জোর, আবার তেমনি চালাতে লাগল যেমন চালাচ্ছিল আগে। ভীমবেগে উড়ে চলল আমাদের এরোপ্লেন; বঙ্গোপসাগরের উপকূল ধরে পৌছুলাম শেষ পর্যন্ত বর্মার আকিয়াব সহরে।

"সেখান থেকে উড়ে পৌছুলাম রেঙ্গুন। রেঙ্গুনে কাটালাম একদিন মহা আনন্দে। তার পর আবার ছাড়লাম রেঙ্গুন ছাড়বার সময় ঘটল আমাদের এক ভীষণ বিপদ। এরোড্রোম ছেড়ে উঠবার সময় আমাদের প্লেনখানির তলদেশের সঙ্গে একটা গাছের মাথায় লাগল বেশ একটু ধাক্কা, সমস্ত প্লেনখানি উঠল প্রচণ্ড জোরে কেঁপে; ভয়ে আমাদের চোখ বন্ধ হয়ে এল—ভাবলাম হয়ত ইহলীলা আজ আমাদের এখানেই শেষ হল। যাই হোক; সে ফাঁড়া কাটিয়ে এরোপ্লেনটি উর্ধ্বে উঠে গেল। ইরা এবারও সারথি এ বায়ুরথের।

"এর পর আমাদের গন্তব্য স্থান হল শ্যামের রাজধানী ব্যাংকক্। মেঘে-ঢাকা পর্বতশ্রেণী পার হওয়ার জন্য ইরাকে প্রায় এগারো হাজার ফুট উপরে ওঠাতে হল তার রথটিকে—এত উঁচুতে উঠেও কিন্তু পাতলা কুয়াসা আর বৃষ্টি

আমাদের পথরোধ করল হঠাৎ। পথ দেখতে না পেয়ে আন্দাজে চালানোর মত বিপদ আর নেই এসব ক্ষেত্রে। কিছুক্ষণ আমরা চললাম এক রকম আন্দাজে। খানিকক্ষণ চলার পর মনে হল পর্বতশ্রেণী পার হয়ে এসেছি আমরা। অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে প্রায় সাত হাজার ফুট নীচে নেমে এলাম। কিন্তু নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ সামনে কালো মত কি একটা রয়েছে দেখা গেল। ইরা ক্ষিপ্রগতিতে প্লেনটিকে দিল ঘুরিয়ে।

"কিন্তু, শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে সে কালো মত পদার্থটি আর কিছু নয়— সাদা মেঘের আধ ফাঁক দিয়ে পৃথিবীর খানিকটা দেখা যাচ্ছিল; সাদা মেঘের তুলনায় পৃথিবীর বুক তাই অত কালো দেখাচ্ছিল। আরও খানিকটা নীচে নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে মেঘের স্তরও শেষ হয়ে গেল। এবার সামনে সেগুন বন—বহু দূর পর্যন্ত চলছে সে বন। সেই বনভূমি পার হয়ে শেষে পৌঁছুলাম 'ব্যাংকক্'এ।

"ব্যাংকক্ ছাড়ার পরই দেখা মিলল মালয়-উপদ্বীপের। মালয়-উপদ্বীপ ধরে চললাম সিঙ্গাপুর অভিমুখে। হঠাৎ আরম্ভ হল বৃষ্টি—বৃষ্টির বেগ ক্রমশঃই বাড়তে বাড়তে দারুণ অবস্থায় এসে দাঁড়াল। ইরা আকুলভাবে বলল আমাকে —'ছোড়দা ভাই, আমি যে আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না, সামনের সবকিছু যেন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে; নামাব প্লেন? না হলে যদি দিক ভুল হয়ে যায়?'

"আমি বললাম—'এখানে প্লেন নামবার কোন উপায়ই নেই। এর নীচে গভীর জঙ্গল, অতি বড় সাহসী পাইলট্ও এখানে প্লেন নামাবার কথা ভাবতে পারে না। চেষ্টা করে দৃষ্টি ঠিক রাখ্ বোন; ভয় নেই, চালা। সিংগোরায় গিয়ে নামব আমরা।"

"চলল আমাদের এরোপ্লেন—দারুণ বৃষ্টির মধ্যেই। সিংগোরায় পৌঁছুলাম শেষ পর্যন্ত। কিন্তু, এরোড্রোমে যখন নামল আমাদের এরোপ্লেন তখন দেখলাম যে এরোড্রোমটি একেবারে বৃষ্টির জল জমে জলাভূমিতে পরিণত হয়েছে। অদ্ভুত দক্ষতা ইরার। আশ্চর্য হয়ে গেলাম। আমি নিজে অত সুন্দরভাবে নামাতে পারতাম না প্লেনখানিকে। আমার কাছে হলে হয়ত উলটে যেত সেটা!

"যাই হোক ঠিক করলাম, রাত্রিটা এখানে কাটিয়ে পরদিন যাত্রা করব সিঙ্গাপুর অভিমুখে। বড় ক্লান্তি আসছিল। ইরারও দেখলাম ক্লান্তি এসেছে বেশ। কিন্তু দেহে ক্লান্তি এলেও মনে ওর একটুও ক্লান্তি নেই।

"আমি বললাম—'কেমন জব্দ, আর ছোড়দার সঙ্গে এরোপ্লেন চালাবি? কি বলিস—আমি চালাব এবার?"

"ইরা হিটলাবী ভঙ্গিতে বলল—'জব্দ কিসের? আমার ত দারুণ ফুর্তি হচ্ছে। তুমি চালাবে কি? মনে নেই, কথা দিয়েছ সিঙ্গাপুর পর্যন্ত চালাব আমি? সিঙ্গাপুর গিয়ে তোমার হাতে প্লেন ছেড়ে দেব—বুঝলে?'

"আমি হেসে বললাম, 'বেশ বীরনারী, তাই হবে। এখন চল, একটু কিছু খেয়ে রাত্রিটা একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক।'

"খাওয়া শেষ করে শুয়ে পড়লাম, অল্পক্ষণ পরে দু'জনেই পড়লাম ঘুমিয়ে।

"রাত্রি তখন কত জানি না—হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। দেখি, ইরা ডাকছে—'ছোড়দা, ছোড়দা—'

"আমি চমকে উঠে বসলাম, জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি হয়েছে ইরা?'

"ইরা বেশ একটু ভীতভাবেই বললে—'ছোড়দা, বাইরে কি রকম একটা শব্দ হচ্ছে—শুনছ?'

"কান পেতে শুনলাম—সত্যিই, বহু দূর থেকে একটা গোঁ গোঁ শব্দ যেন ক্রমশঃই এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। শব্দটা যেন ক্রমেই বাড়ছে—

"ইরা ব্যাকুল হয়ে বলল—'ছোড়দা, দারুণ ঝড় আসছে। এরোপ্লেনটার কিছু ক্ষতি হবে না ত?'

"আমার বুকটা তখন কাঁপছে ভয়ে। ঐ সর্বনেশে ঝড়ের সঙ্গে এর আগেও আমার পরিচয় হয়েছে দু'-একবার। কোন কথা না বলে তখুনি বার হয়ে পড়লাম; ইরাও বার হয়ে এল আমার পিছনে পিছনে।

"ইরা বললে—'ছোড়দা, কি করে বাঁচাবে প্লেনখানাকে?'

"আমি বললাম—'মাটির সঙ্গে কোনরকম করে ওকে আটকাতে হবে—নইলে ঐ সর্বনেশে ঝড় আমাদের এত সাধের প্লেনখানিকে উল্‌টে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে যাবে।'

"সারারাত্রি চলল উন্মত্ত প্রকৃতির তাণ্ডবলীলা। সমস্ত রাত্রি ধরে চলল আমাদেরও প্রাণান্তকর চেষ্টা, শুধু প্লেনখানিকে কোনওরকমে মাটির সঙ্গে আটকে রাখবার জন্য।

ভোর হওয়ার একটু আগে ঝড় গেল থেমে; বৃষ্টি তখনও অল্প অল্প পড়ছে। সমস্ত রাত্রি ভিজেছি দু'জনে। ইরাকে কতবার বলেছি—'ইরা,

তুই যা, কাপড় চোপড় বদলে শুয়ে পড়গে, ইরা তার উত্তরে কিছু বলেনি —একটু হেসেছে কেবল। এই বিপদের মধ্যে সে তার দাদাটিকে একা ফেলে চলে যাবে—শুধু তার নিজের জন্যে—এতখানি ভীরু সে নয়।

"মনে পড়ে—মনে পড়ে সে রাত্রে ইরার সে মূর্তি। পুরাণে পড়েছি, ইতিহাসে পড়েছি বহু বীরনারীর কথা, আমার এ আদরের ছোট বোনটির সে মূর্তি মনে পড়লে তাদের কারো তুলনায় তাকে ছোট বলে মনে হয় না। সে কী প্রলয়ঙ্করী রাত্রি! বৃষ্টি নেমে আসছে ধরার বুকে জলপ্রপাতের মত। ঝড়ের সে কী ক্রুদ্ধ গর্জন! আকাশের বুক চিরে মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে —মাঝে মাঝে বজ্রধ্বনিতে পৃথিবীর বুক যেন ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। এই দুর্যোগের সঙ্গে লড়ছে সমানে ইরা—আমার পাশে দাঁড়িয়ে। বৃষ্টিতে তার সর্বাঙ্গ গেছে ভিজে, ঝড়ের ঝাপটা কত বার তার দেহকে দিচ্ছে মাটির বুকে লুটিয়ে, কত বার তাকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে আছড়ে ফেলছে ঐ কঠিন ধাতুময় এরোপ্লেনের গায়ে, কত আঘাত যে সে পেয়েছে, কত জায়গায় যে তার গেছে কেটে! কাদায় হাত পা চোখমুখ ভর্তি হয়ে গেছে, অথচ কোনও ভ্রূক্ষেপই নেই তার এ সবে! অদম্য তার তেজ; কী তার সাহস, কী তার শক্তি, কী তার দৃঢ়তা! ছোট্ট বোনটি আমার! ননীর মত কোমল তার দেহ, কুসুমের মত পেলব তার বাহু দুটি—সেই দেহে সেই বাহুতে আজ যেন নেমেছে মহাশক্তির প্রভাব! আমার নিজের শক্তি, সাহস আর মনের দৃঢ়তা সম্বন্ধে মনে মনে ছিল দারুণ এক গর্ব! কিন্তু, আজ সে গর্ব ধূলোয় লুটিয়ে পড়ল ছোট বোনটির শক্তি, সাহস আর দৃঢ়তার কাছে। অত বিপদের মধ্যেও বুকটা আমার ফুলে উঠলো গর্বে। আনন্দে,—এই ভেবে যে ও আমারই বোন—আমারই হাতে গড়া প্রিয় শিষ্য!

"সকাল বেলা ও পড়ল ঘুমিয়ে, যুদ্ধে বিজয়িনী পরিশ্রান্ত বীর নারীর মত দেখাচ্ছিল ওকে! যখন ওর ঘুম ভাঙল তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।

"পরদিন ছাড়লাম সিংগোরা—ইরার হাতেই রইল প্লেন-কণ্ট্রোলের ভার।

"সিঙ্গাপুরের পথটুকু বেশ ভালো ভাবেই কাটল। নিরাপদে পৌঁছুলাম।

"সিঙ্গাপুরে কাটালাম দু' দিন ঘুরে ঘুরে। তারপর কিছু পেট্রোল কিনে নিয়ে ছাড়লাম সিঙ্গাপুর। এবার ইরা ছেড়ে দিল আমার উপর এরোপ্লেন কণ্ট্রোলের ভার। এবার আমিই লাগলাম এরোপ্লেন চালাতে।

"অনেকখানি আশা আর আনন্দ নিয়েই সিঙ্গাপুর ত্যাগ করলাম। কিন্তু

তখন স্বপ্নেও ভাবিনি যে আমাদের জীবনের যা কিছু আনন্দ তা নিঃশেষ হয়ে গেল সেইদিনই।

"অস্ট্রেলিয়া আর সিঙ্গাপুরের মধ্যে প্রায় দু'হাজার মাইল বিস্তৃত মহাসাগর। তার মাঝে মাঝে দ্বীপের সারি—তাদের উপর দিয়ে উড়ে চলল আমাদের প্লেনখানি। বেশ চলেছি, হঠাৎ সামনে দেখি ঘন কুয়াসার জাল বোনা। আমার প্রতি ধমনীর মধ্যে রক্ত যেন জমে বরফ হয়ে গেল—মহা এক আশঙ্কায়। কী সর্বনাশ! কুয়াসার মধ্যে কি করে চলতে হয় জানি, কী করে এরোপ্লেনের 'লেভেল' আর ব্যালান্স্' ঠিক রাখতে হয়, কী সাবধানতা অবলম্বন করলে প্লেনের মুখ নীচু হয়ে একেবারে মাথা গুঁজে 'ডাইভ' না দেয়—কী উপায় অবলম্বন করলে প্লেনের পাখা কাৎ হয়ে না পড়ে; 'হরাইজন'—মানে দিক্‌চক্রবালের দিকে লক্ষ্য রেখে চলতে হয় এসব ক্ষেত্রে। কিন্তু এই কুয়াসা যদি সামনে চলে তা হলে কোন্ দিকে যাব—দিক ঠিক করব কি করে? এই মহাসাগরের বুকের উপর দিয়ে চলেছি, কোথাও নামাবারও ত উপায় নেই, তা হলে যে সলিল-সমাধি!

"যা ভয় করেছিলাম তাই হল। দু'দিন দু'রাত্রি কেটে গেল, কুয়াসা কাটল না। সমানে চালাতে লাগলাম কুয়াসার মধ্যেই—যদি অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছুতে পারি। সময় কেটে যেতে লাগল হু-হু করে। তিন দিন পরে কুয়াসা কেটে গেল, কিন্তু তখন দেখলাম যে আমরা দিক ভুল করে অন্য কোন্ দিকে চলে এসেছি! এ কী করলাম! নিজের জন্যে ভাবিনে, মৃত্যুকেও ভয় করিনে। কিন্তু ইরা, আমার অত আদরের বোন—ইরা! ওর জীবনও কি শেষ হবে আমার সঙ্গে? নীচে ঐ বিস্তৃত জলধি—কোথাও ত স্থলের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি না! শেষ পর্যন্ত হয়ত সলিল-সমাধিই হবে আমাদের। যাই হোক, অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে চালাতে লাগলাম এরোপ্লেন। যতক্ষণ পেট্রোল না ফুরোয় ততক্ষণ ত চালাই, খুঁজে দেখি এদিক ওদিক, যদি কোথাও স্থলের দেখা মেলে। দেখা মেলে যদি তা হলে হয়ত জীবন রক্ষা হতে পারে—নইলে মৃত্যুই হবে আমাদের এ অভিযানের পরিণতি—"

এই পর্যন্ত বলে অজয় থামল। চুপ করে রইল খানিকক্ষণ। একটু পরে দেখা গেল অজয় ঘুমিয়ে পড়েছে ক্লান্তিতে। কেউ আর তাকে জাগিয়ে বিরক্ত করল না। ললিতা তার গায়ে একটা চাদর-চাপা দিয়ে দিলেন; তার পর আস্তে আস্তে সকলে বার হয়ে গেলেন আলোটা নিভিয়ে দিয়ে।

পরদিন সকাল। বাড়ীর সকলেই চায়ের টেবিলে উপস্থিত, অজয়ও। গত রাত্রে বিশ্রাম নিয়ে আজ তার ক্লান্তিটা যেন একটু কমেছে মনে হচ্ছে—অবশ্য দেহের ক্লান্তি, মনের নয়। মনটা তার সমান ক্লান্তিতেই ভরে আছে।

চায়ের কাপটা শেষ করে সে বললে—"কাল রাতে কী ঘুমই নামল চোখে! আপনাদের অনেকেরই হয়ত সারা রাত জেগে কেটেছে—রণু আর ইরার কি হল তাই ভেবে ভেবে। কিন্তু, আমি—"

ললিতা বাধা দিয়ে বললেন, "না ভাই, তাতে কি হয়েছে? রাতও ত অনেক হয়েছিল কাল। তোমার শরীর এত খারাপ; কাল রাতেই তোমাকে টেনে এনে আমরাই করেছি অত্যাচার তোমার উপর।"

অজয় একটু ম্লান হেসে বললে—"আচ্ছা, শুরু করি তার পর থেকে—রণুরই ভাষাতেই বলি যেমন বলছিলাম—

"—চালাতে লাগলাম আমার প্লেনখানি অনির্দিষ্টভাবে—শূন্যপথে পাগলের মত ঘুরে বেড়াতে লাগলাম, যদি কোথাও স্থলের দেখা মেলে। পেট্রোল ফুরিয়ে আসতে লাগল—সঙ্গে সঙ্গে আমার আর ইরার জীবনের শেষের মুহূর্ত ক'টিও। ইরার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম—ভীতির কোন চিহ্নই সেখানে নেই, উদ্বেগের কোন ছায়াই পড়েনি ওর মুখে। আশ্চর্য মেয়ে!

পেট্রলের ট্যাঙ্ক খালি হয়ে এসেছে—আর মাত্র ঘণ্টা পাঁচ-ছয় চলবে কোনরকমে আমাদের প্লেনখানি—তার পর, তার পর নামবে সে নীচের দিকে সজোরে, প্রবেশ করবে অতল জলধিগর্ভে। মুহূর্তগুলি হু-হু করে কাটতে লাগল। মৃত্যুর সঙ্গে সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে চোখ ফেটে জল বার হয়ে এল ইরার জন্য। রুদ্ধকণ্ঠে ডাকলাম—'ইরা, বোনটি—'

"ইরার মুখে সে কী অপূর্ব হাসি!...আশ্চর্য! সে বললে হেসে—'ছোড়দা, কি ফুর্তিই যে হচ্ছে আমার তা তোমাকে বলতে পারি নে। মরণ ত একদিন আসতই ছোড়দা, না হয় আরও দু'দশ বছর পরে—এই ত তফাৎ! কিন্তু সেই একঘেয়ে চির-পুরাতন ভাবে বিছানায় শুয়ে শুয়ে, রোগে ভুগে ভুগে মরা—ছিঃ। এ কেমন নতুন রকমের মৃত্যু, বল ত? উদার আকাশের নীচে, এরোপ্লেনে চড়ে নেমে যাব অতল জলধি-তলে আমরা দুটি ভাইবোন; সেখানেই হবে আমাদের শেষ শয়ান!'—বলে সে যেন আনন্দে চোখ দুটি বন্ধ করল।

"আর মাত্র দু'-এক ঘণ্টা প্লেনটি চলবে, তারপর সব শেষ, ভাবলাম, কেন অমন ভাবে মরব? মৃত্যু এসে কেন আমাদের কণ্ঠরোধ করবে? আমরাই এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে করব আলিঙ্গন। পেট্রল ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই প্লেনখানি নিয়ে 'ডাইভ' দেব নীচের দিকে। সোজা চলে যাব সমুদ্রের গর্ভে।

"প্লেনখানিকে নিয়ে ডাইভ দিতে যাচ্ছি, হঠাৎ ইরা ডাকল—'ছোড়দা!' দেখি, ইরার চোখ দু'টো যেন জ্বল জ্বল করছে। সে বলল—'ছোড়দা, ঐ দেখ, দূরে কালো মত কি দেখা যাচ্ছে—হয়ত কোনও দ্বীপ হতে পারে—হয়ত মরা হল না আর আমাদের এ যাত্রা। চালাও ঐ দিক্ লক্ষ্য করে।'

"সত্যিই দূরে, সমুদ্রের বুকের মধ্যে কালো মত জমাট কি একটা দেখা যাচ্ছিল। কোন দ্বীপ হওয়ারই সম্ভাবনা। রক্ত আমার চঞ্চল হয়ে উঠল, বুকটা আশার আনন্দে উঠল দুলে। জীবন—আবার হয়ত চলব জীবনের পথে। যে মরণকে করতে যাচ্ছিলাম আলিঙ্গন, তাকে দিলাম বিদায়। সেই কালো জায়গাটা লক্ষ্য করে চালালাম আমাদের প্লেন।···কিন্তু, কিন্তু এ কি? কতখানি এগিয়ে গেলাম, তবুও ঐ জায়গা আগে যত দূরে ছিল এখনও তত দূরেই মনে হতে লাগল! অদৃষ্টের এ কী পরিহাস! মরণের জন্য ত প্রস্তুতই হয়েছিলাম, তবে আবার বাঁচবার এ দুরাশা মনে জাগিয়ে এ কষ্ট দেওয়া কেন?

"ইরা বললে—'চালাও ছোড়দা, হতাশ হয়ো না। যত দূর চলে চলুক প্লেনখানি। যদি না পৌছুতে পারি ও জায়গায়—প্লেনখানি যদি ডোবেই, আমরা ডুবব না। প্লেন ডোববার ঠিক আগেই প্লেন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ব, তার পর? তার পর আছে তোমার আর আমার বাহুতে শক্তি আর সাঁতারের ক্ষমতা।'

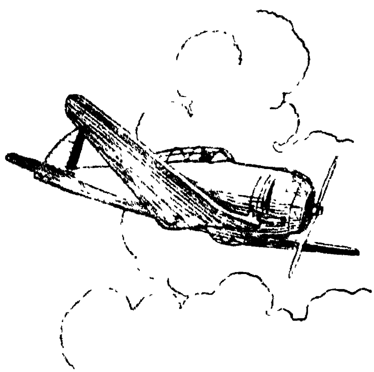
"আমি আর কিছু বললাম না ওকে। অকূল সমুদ্রের বুকে সাঁতার কাটতে গেলে কতখানি শক্তির প্রয়োজন তা জানে না ইরা; তা ছাড়া হাঙর যে হানা দেয় সমুদ্রের মাঝে তাও হয়ত ওর খেয়াল নেই।

"খানিক পরে অদৃষ্ট বোধহয় সুপ্রসন্ন হল; জায়গাটা কাছে মনে হতে লাগল—দূরবীণ দিয়ে স্পষ্ট দেখা গেল এবার যে সত্যিই সেটা একটা দ্বীপ, চতুর্দিকে ভীষণ বন, সমুদ্রের ধারে খানিকটা শুধু বেলাভূমি।

"আর একটু—আর একটু যেতে পারলেই পৌছুতে পারি। পারব না, পারব না?···পেট্রল শেষ হয়ে গেছে—প্লেনের ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল বলে।

নামছে—নামছে প্লেন।—দ্বীপটাও এসে গেছে, আর শ' কয়েক গজ মাত্র।... ব্যস, আর ভয় নেই! এসে গেছি, এসে গেছি! যদি নামবার সময় বিপদ না ঘটে!

"যতদূর সাধ্য তত দূর সাবধানে নামালাম প্লেন; তবুও সামান্য ধাক্কা লাগল একটা গাছের সঙ্গে। প্লেনটা ভেঙ্গে গেল দু' এক জায়গায়। ইরার কপালটা কেটে গেল; আমার বাঁ হাতে আঘাত লাগল, শরীরের দু' এক জায়গায় কেটেও গেল।...যাই হোক, আপাততঃ প্রাণে ত বাঁচলাম; মৃত্যুর সামনা-সামনি দাঁড়িয়েও তাকে এড়াতে পেরেছি—ইরা বেঁচেছে।



"আঘাতের ধাক্কা সামলে ওঠার পর মনে হল—আপাত-মৃত্যুর হাত থেকে ত রক্ষা পেলাম বটে, কিন্তু সত্যিই কি রক্ষা পেল আমাদের জীবন? এ কোন্ জায়গা? এখানে এই ভীষণ অরণ্যবেষ্টিত দ্বীপে কোনও মানুষ বাস করে কিনা তাও জানি না। বন্য জন্তুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়াও হয়ত দুষ্কর হবে। অদূর ভবিষ্যতে উদ্ধার পাওয়ার কোনও আশা আছে কি না—কে বলবে? যতদিন উদ্ধার না পাই ততদিন জীবনধারণ করব কি খেয়ে?

"সন্ধ্যা নেমে আসছিল ক্রমশঃ সেই অজানা দ্বীপের বুকে। সামান্য খেয়ে দু'জনে সে রাত্রির মত আশ্রয় নিলাম এরোপ্লেনের ভিতরে। চোখ জড়িয়ে আসছিল ঘুমে—আমার যে রিভলভারটা ছিল সেটা খুলে হাতের কাছে রাখলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লাম দু'জনে।

"রাত্রি কোথা দিয়ে কেটে গেল জানতে পারলাম না। আমাদের ঘুম ভাঙ্গল যখন তখন সে অজানা দ্বীপের উপর প্রভাতের আলো নেমে এসেছে।

"কাটল দু'দিন! সঞ্চিত আহার্যও শেষ হয়ে এল। সামনে গভীর অরণ্য—প্রবেশ করতে সাহস হয় না। তবুও প্রবেশ করতে হল আহারের অন্বেষণে। ইরাকে সঙ্গে নিয়ে সেই গভীর অরণ্যের ভিতর দিয়ে চলতে শুরু করলাম। প্রতি মুহূর্তে কি এক অজানা বিপদের আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠতে

লাগল। এই বিপদশঙ্কুল পথে একমাত্র ভরসা আমার রিভলভারটি। ডান হাতে রিভলভারটি ধরে আর বাঁ হাতে ইরার হাত ধরে অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হতে লাগলাম সেই ভীষণ অরণ্যের পথে।

"বেশ খানিকক্ষণ চলেছি, হঠাৎ মনে হল, আমাদের আশে পাশে বনের মধ্যে কারা যেন আমাদের দু'জনকে অনুসরণ করছে। সমস্ত শরীর শিউরে উঠল আমাদের। কী সর্বনাশ! কি করব? আর অগ্রসর হব, না ফিরে যাব তাই ভাবতে লাগলাম। ভেবে দেখলাম, পিছিয়ে কোন লাভ নেই; আমাদের ত কোন নিরাপদ স্থান নেই যে পিছিয়ে সেখানে গিয়ে আশ্রয় নেব! শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম, অদৃষ্টে যাই থাক, এগিয়েই যাব। রিভলভারটা শক্ত করে হাতের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে চললাম এগিয়ে—"

অজয়ের কথার মাঝেই রণজিতের বাবা—বিজয়বাবুকে উঠতে হল, বাইরে কে একজন তাঁকে ডাকছেন।

অজয় তাই চুপ করল একটু; অপেক্ষা করতে লাগল বিজয়বাবুর ফিরে আসার জন্য।

পাঁচ

বিজয়বাবু ফিরে এসে বসলেন। অজয় আবার শুরু করল রণজিতদের কাহিনী রণজিতেরই ভাষায়—

"...অতি সন্তর্পণে আমরা অগ্রসর হতে লাগলাম বনের ভিতর দিকে।

"আমাদের আশে পাশে কিন্তু সমানে পায়ের শব্দ শোনা যেতে লাগল। অজানা একটা বিপদের আশঙ্কায় সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতে লাগল। যে কোন বিপদেরই সামনা-সামনি দেখা মিললে সাহসের হয়ত তত অভাব হয় না, কিন্তু, যেখানে বিপদ থেকে অন্তরালে আর আভাসটি কেবল তার পাওয়া যায় সামনে, সেখানে বুকের রক্ত জমাট বেঁধে যায় যে!

"ইরা বললে, 'ছোড়দা, চল, ফিরি।' ওর মত মেয়ের মুখেও ভয়ের চিহ্ন পরিস্ফুট।

"শেষ পর্যন্ত ফিরলামই। অস্পষ্ট পদধ্বনির কিন্তু বিরাম নেই। ভুতুড়ে ব্যাপারে আমাদের বিশ্বাস নেই কোনকালে—ইরারও নেই, আমারও নেই; নইলে ভাবতাম হয়ত যে কোনও অশরীরী আমাদের পিছু নিয়েছে। দৃষ্টির অন্তরালে থেকে কে বা কারা যে আমাদের অনুসরণ করছে তা ঠিক বুঝে

উঠতে পারলাম না—তবে কেউ যে করছে এ বিষয়ে সুনিশ্চিত। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত সেই ভীষণ অরণ্যের বাইরে এসে পড়লাম; সঙ্গে সঙ্গে সে অস্পষ্ট পদধ্বনিও আর শোনা গেল না।

"সেদিন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও আশ্রয় নিলাম আমাদের প্লেনখানির অভ্যন্তরে। ইরা বললে, 'ছোড়দা, আমার ধারণা বনের মধ্যে যে শব্দ আমরা শুনেছিলাম সেটা আমাদের মনের ভুল নিশ্চয়। যদি আমাদের অনুসরণই করে থাকে কেউ, তাহলে তারা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে গেল আবার ফিরে আসবার সময় সঙ্গে সঙ্গে এল, অথচ তারা না এল আমাদের সামনে না করল কোন আক্রমণ। এ রকম উদ্দেশ্যহীনভাবে আমাদের অনুসরণ করে তাদের লাভ কী?'

"ইরার কথার আর জবাব দিলাম না। আমি ভাবছিলাম যে এসব দ্বীপে বন্য জাতির অভাব নেই। হয়তো ঐরকম দু'জন-একজন বুনো শুধু আমাদের লক্ষ্য করে চলে গেল, হয়ত তারা হঠাৎ আক্রমণ করতে সাহস পায়নি—হয়ত সদলবলে এসে তারা অতি শীঘ্রই আমাদের আক্রমণ করবে। ভয়ে শিউরে উঠল গা। বিদেশীয়দের প্রতি এদের অমানুষিক অত্যাচারের কথা অনেক পড়েছি, অনেক শুনেছি; কিন্তু, ইরাকে বলে লাভ কি? দেখা যাক কতদূর কি হয়। কোথাও পালাবার উপায় নেই, আর অনিশ্চিত বিপদের আশঙ্কায় এ অসীম সমুদ্রের বুকে ভাসাও চলে না। আর ভাসব কিসে চড়ে? রাত্রি ক্রমশঃ গভীর হয়ে এল, আদরের বোনটি আমার নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুচ্ছে। ওর সত্যিই সুদৃঢ় ধারণা যে ওটা আজ মনের ভুল হয়েছিল আমাদের। শব্দটা কাল্পনিক একেবারে।

"রাত্রি গভীর হতে গভীরতর হতে লাগল। আমার চোখে কিন্তু ঘুম আসছিল না কিছুতেই।

"দুশ্চিন্তাতে মন ভরে আছে। হঠাৎ বনের মধ্যে যেন বহু অস্পষ্ট আলো দেখতে পেলাম। ক্রমশঃ আলোগুলি এগিয়ে আসতে লাগল। একটু পরেই সেই অস্পষ্ট আলোতে দেখলাম, ভীষণাকৃতি বহু কৃষ্ণ মূর্তি এগিয়ে আসছে আমাদেরই দিকে। তাদের অনেকেরই হাতে মশাল, আবার অনেকের হাতে বর্শা, আবার অনেকের হাতে বা তীর-ধনুক। অতি সন্তর্পণেই এগিয়ে আসছে,—আমরা যাতে জানতে না পারি এইজন্যই কি ওদের এত সর্তকতা? ভেবেছে আমরা নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে আছি। ওরা ত জানে না যে রাত আমার

জেগেই কাটছে! কিন্তু জেগে কেটেই বা লাভ কী? আমি একা, ওরা যে অসংখ্য! আমার হাতে রিভলভার—তাতেই বা সুবিধে কী?

"ওরা এসে পড়েছে—

"ইরাকে জাগালাম; ইরা লাফিয়ে উঠে বসল।

"ওরা এসে ঘিরে ফেলল আমাদের। উঃ, কী আনন্দ ওদের। কী চীৎকার আর সঙ্গে সঙ্গে কী উৎকট নৃত্য!

"ওদের মধ্যে থেকে কয়েকজন এগিয়ে এল আমাদের কাছে। একজন এসেই কি একটা বলে ইরার হাত ধরে সজোরে টান দিলে; আমার শরীরের সমস্ত রক্ত গরম হয়ে উঠল। সেই দানবটাকে গুলী করবার জন্য রিভলভারটা তুলে ধরলাম। ইরা চীৎকার করে উঠল, 'ছোড়দা! রিভলভার নামাও!' আমি মন্ত্রমুগ্ধবৎ, রিভলভার নামলাম।

"ইরা বললে—'বাঁচবার আশা যদি একটুও থাকে, গুলী করলে তা আর মোটেই থাকবে না। জান তো, ওদের প্রত্যেক তীরে বিষ মাখানো থাকে। আমার সামনে ওরা তোমাকে এখনি তাহলে মারবে তীর, কিংবা বর্শা বিঁধে দেবে—আর তুমি যন্ত্রণায়—ওঃ! না না, তার চেয়ে আত্মসমর্পণও ভাল!"

"বুদ্ধিমতী বোনটি আমার—ওর কথামত আত্মসমর্পণই করলাম। এরই মধ্যে দু' তিনটে বুনো এসে আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। ওদের মধ্যে একজন —বোধহয় ওদের সর্দারই হবে—কি বললে ঐ ক'জনকে। ওরা দড়ির মত একটা জিনিস দিয়ে আমার হাত দুটো বেঁধে ফেলল। তারপর ইরাকে আর আমাকে ইসারা করলে ওদের সঙ্গে যাবার জন্যে। আমরা চললাম ওদের কথামত—ওদের সঙ্গে সঙ্গে। ওরা আমাদের ঘিরে তাণ্ডব নৃত্য করতে করতে চলল।

"কিছুদূর এসে বনের মধ্যে এক জায়গায় একটা বাঁশের তৈরি ঘরের মত দেখা গেল। ঘরটার মধ্যে তখনও ঘোর অন্ধকার। তার মধ্যে নিয়ে গিয়ে ঘরের দেওয়ালে একটা বাঁশের সঙ্গে বাঁধল আমাকে, আর একটাতে বাঁধল ইরাকে। তারপর ঘরের দরজাটা বন্ধ করে তারা সব চলে গেল। শেষ পর্যন্ত অদৃষ্টে এই ছিল! এর চেয়ে কত সুখের মৃত্যু হত যদি সমুদ্রগর্ভে হত আমাদের শেষ সমাধি!

"এতদিন বইএ পড়েছি এইসব অসভ্য দ্বীপবাসীদের কথা। কল্পনায় তাদের ছবি এঁকেছি এতদিন—আজ বাস্তবেই মিলল তাদের দেখা।

"ইরা বীরনারী—মৃত্যুকে সে ডরায় না, এতদিন কয়েকবার সামনা-সামনি দেখেও ওর মুখের হাসি মেলায়নি। আজ মৃত্যুভয় নয়—ঐ অসভ্যদের হাতে পীড়নের ভয়ে, অত্যাচারের ভয়ে ও পড়েছে নুয়ে। অন্ধকার ঘর কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

"হঠাৎ ঘরের একটা কোণ থেকে একটা অস্ফুট কাতর ধ্বনি ভেসে এল যেন! কান খাড়া করে রইলাম।

"অল্পক্ষণ পরে সেই ঘরের কোণ থেকেই কে যেন অতি কাতরভাবে কথা কইল—পরিষ্কার ইংরাজিতে।

ছয়

"শোনা গেল—'আপনারা কে? কি করে এ দ্বীপে এসে পড়লেন?'

উত্তর দিলাম ইংরাজিতে। ঐ অজানা স্বরকেই উত্তর দিলাম, বললাম আমরা কে, কী করে এসে পড়েছি এই দ্বীপে। এবার ঐ স্বরকে জিজ্ঞাসা করলাম—'আপনি কে, আপনিই বা কি করে এলেন এ দ্বীপে?'

স্বর উত্তর দিলে—'আমি একজন ইংরাজ বৈজ্ঞানিক—এথনোলজিস্ট কাকে বলে জানেন? আমি একজন তাই। দ্বীপে দ্বীপে ঘুরে ঘুরে আমি এই সমস্ত অসভ্য আদিম জাতিদের সব তথ্য সংগ্রহ করি। ওসেমিয়া দ্বীপ থেকে এমনি সব তথ্য সংগ্রহ করে ফিরছিলাম আমি। পথিমধ্যে প্রচণ্ড ঝড়ে আমার জাহাজ গেল ডুবে। লাইফ-বোটে চড়ে ভাসতে ভাসতে শেষ পর্যন্ত ঠেকেছিলাম এই দ্বীপে। আপনাদেরই মত ভাগ্য দোষে পড়লাম এদের হাতে। এরা এদিকের অন্যান্য দ্বীপবাসীদের চেয়েও আরও অসভ্য, আরও বিশ্রী এবং ভীষণ এদের রীতি-নীতি।' এদিকে এতক্ষণে ভোর হয়ে এসেছে, সূর্য হয়ত উঠেছে আকাশে; তবে এই বনের মধ্যে অসংখ্য বৃক্ষরাজি ভেদ করে তার রশ্মি এসে পৌঁছয়নি এত দূর। তা হলেও আলো হয়েছে বেশ। ঘরটার অনেক উঁচুতে একটা জানালা ছিল, সেটা দিয়ে ঘরের মধ্যে আলো এসে পড়েছে। সেই আলোতে দেখতে পেলাম যে ঘরের কোণে হাত-পা-বাঁধা অবস্থায় এক ভদ্রলোক পড়ে আছেন। তাঁর দেহ যেন মাটিতে মিশে গেছে। তিনি বলতে লাগলেন—'আপনারা নিশ্চয়ই জানেন না যে এদের মধ্যে রীতি আছে—হেড হানটিং মানে মানুষের মাথা কেটে দেবতার সামনে ডালি দেওয়া; তাতে নাকি ওদের জাতির শক্তি বাড়ে।

হোয়াইট্ ম্যান, মানে সাদা চামড়া যেসব মানুষের, তাদের মাথাই ওদের কাছে বেশী মূল্যবান। আপনাদের দেশের লোককে ছাড়ে না—বিদেশীয় ত?' একটু থেকে আবার বললেন—'আমাকে নিয়ে গেল বলি দেওয়ার জন্য। বহু সংখ্যক লোক জড় হয়েছে, তাদের সামনে একটা প্রকাণ্ড লম্বা পাথর সেইটাই নাকি দেবতা। আর এদিকে একটা উঁচু জায়গায় বসে ওদের সর্দার। আমাকে মাঝখানে রেখেছে ফেলে। আমাকে ঘিরে বসেছিল ওরা সকলে দু'তিনটি সারি করে। মদের মত কি একটা জিনিস খাচ্ছিল সবাই। খানিক পরে ওরা সকলে উঠে দাঁড়াল, আমার চারিদিকে ঘুরে ঘুরে নাচ শুরু করে দিল, সঙ্গে সঙ্গে বাজতে লাগল ওদের সেই মাদলের মত বাজনা।...তার একটু পরে ওদের মধ্যে একজন আমাকে নিয়ে গিয়ে ফেলল সেই পাথরটার সামনে, আর একজন খাঁড়ার মত কি একটা অস্ত্র নিয়ে এল।...সে আমার ঘাড়ের উপর খাঁড়ার মত অস্ত্রটা তুলছে—হঠাৎ সর্দারটা চীৎকার করে উঠল। আমি ওদের ভাষা জানি কিছু কিছু—দ্বীপে দ্বীপে ঘুরে একটু-আধটু শিখেছিলাম। সর্দার বললে—'দেখছিস না, ওর কপালে কাটার দাগ?' সর্দারের চোখ দুটো রাগে লাল হয়ে উঠেছে। অন্য সকলে তখন ভয়ে কাঁপছে! আমাকে বলি দেওয়া আর ওদের হল না।'

"ভদ্রলোকের এই কথায় আমি যেন আশার একটু ক্ষীণ আলোক দেখতে পেলাম। বললাম—'আমার বোনের ত' কপাল কেটে গেছে সেদিন এরোপ্লেন নামাতে গিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে; আমারও দু'এক জায়গায় কেটে গেছে, কপালটাও না হয় এই দেওয়ালে দিয়ে—'

"আমার কথায় বাধা দিয়ে সেই ভদ্রলোক বললেন—'ও কাজও করবার চেষ্টা করবেন না। প্রথমতঃ আপনার বোনের কপাল কাটা না কাটায় কিছুই আসে যাবে না। কারণ স্ত্রীলোককে ওরা বলি দেয় না, উপরন্তু, ওদের সর্দার হয়ত আপনার বোনকে বিবাহই করবে। কারণ ওদের প্রত্যেকের একটি করে স্ত্রী থাকলেও সর্দারের বহু স্ত্রী থাকার নিয়ম। আপনার বোনটিকে যদি বিবাহ করে তাহলে তাঁকে সর্দারের দাসীবৃত্তিই করতে হবে সারা জীবন। বলি দেবে ওরা আপনাকে। আপনি ভাববেন না যে যদি আপনার দেহে কোন কাটা দাগ থাকে বা আপনি অঙ্গহীন হন কোনরকম, তাহলেই আপনি নিস্তার পাবেন।...তা'হলেও আপনাকে মরতে হবে, তবে সে বহু যন্ত্রণা পেয়ে—আমি যেমন যন্ত্রণা পাচ্ছি তেমনি যন্ত্রণা পাবেন। যদি আপনার

দেহে কোন খুঁত থাকে তাহলে আজ দেবতার পায়ে আপনার মাথাটা ছুঁইয়ে এনে ফেলে রেখে দেবে আমার মত হাত-পা বেঁধে। প্রত্যহ একবার করে ঐ পাথরটার কাছে নিয়ে যাবে আর ওর গোড়ায় মাথা ছুঁইয়ে আনবে। একটি বছর এমনি করার পর তখন আপনাকে বলি দেবে—তখন নাকি আর দোষ হয় না। কাজেই, এই রকম এক বছর যন্ত্রণা ভোগ করে মরার চেয়ে প্রথম দিনে মরাই ভাল—মরতে যখন হবে শেষ পর্যন্ত।'

আমি আস্তে আস্তে বললাম—'পালানো যায় না কোনও রকমে?'

ভদ্রলোক হতাশভাবে একটু ভেবে বললেন--"পালাবেন কি করে? বাইরে রাতদিন পাহারা দিচ্ছে একজন। তার উপর পালিয়ে যাবেনই বা কোথায়? ওদের ফাঁকি দেওয়া অসম্ভব যে—'

দরজা খুলে গেল—প্রবেশ করল তিনজন লোক। একজন ঐ ইংরাজ ভদ্রলোকটিকে নিয়ে চলে গেল, বুঝলাম ওঁর দৈনন্দিন মাথা ঠেকানোর পালা হতে চলল। আর দু'জন প্রথমে আমার আর ইরার হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে পরে আমার ডান হাতের সঙ্গে বাঁধল ইরার বাঁ হাত। তারপর ইঙ্গিত করলে ওদের সঙ্গে যাওয়ার জন্যে।

"নিরুপায় ভাবে চললাম ওদের সঙ্গে, কোথায় তা জানি না, কেন তা-ও জানি না। আজই কি বলি দেবে, না, বিশেষ কোনও একটা দিন-ক্ষণ দেখে বলি দেবে—কিছুই জানি না। অনিশ্চিতের মধ্যে পথ চলতে লাগলাম দুই ভাইবোনে ওদের সঙ্গে সঙ্গে—গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়ে।

সাত

"অনিশ্চিতের পথে চলেছি—গভীর অরণ্যের পথে!

"ইরার মুখের সে দীপ্তি গেছে নিভে। অতি ধীরে ধীরে বললে সে, 'ছোড়দা তুমিও জান, মরণকে আমি কোনদিনই ভয় করিনে—বরঞ্চ বিশেষ দু' এক প্রকারের মরণকে আমি ভালবেসে আলিঙ্গন করতে চিরকাল রাজি, সেদিন যেমন নেমে যাচ্ছিলাম এরোপ্লেনে চড়ে সোজা সমুদ্রের অতলগর্ভে; কি সুখের মৃত্যুই হত যে! আজ এদের হাতে মরলে সে রকম সুখের মৃত্যু হয়ত হবে না—তবুও ত রোগে গলা টিপে মেরে ফেলার চেয়ে ভাল।· কিন্তু যা শুনলাম ঐ ভদ্রলোকটির কাছে তাতেই সর্বাঙ্গ শীতল হয়ে আসছে ছোড়দা!·· আমাকে ত ওরা মারবে না—আমাকে ওদের দাসীবৃত্তি

করতে হবে যে আজীবন,—আজীবন সহ্য করতে হবে ওদের অমানুষিক অত্যাচার, উৎপীড়ন। তার উপর—উঃ, আমারই চোখের সামনে ওরা তোমাকে দেবে বলি!'...ইরার চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে জল পড়তে লাগল।

"ইরার চোখে জল! ইরার চোখে জল এই প্রথম দেখলাম আমার জীবনে। আমি জানি, ইরা ভালবাসে তার ছোড়দাকে নিজের চেয়েও। আজ যে ও ব্যথায় ভেঙে পড়েছে সে শুধু এই ভেবে যে ওরা ওর ছোড়দাকে নৃশংসভাবে করবে হত্যা—ওকে না করে।...স্বার্থপর মানুষ! এই মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে ছোট বোনটির এই অসীম ব্যাকুলতার মধ্যেও মনটায় আনন্দের একটু ছোঁয়া লাগল এই ভেবে যে, ছোট বোনটির অন্তরে কতখানি অগাধ ভালবাসাই না জমে রয়েছে আমার জন্য! আমার জন্যই না আজ ও এমনি করে ভেঙে পড়েছে—ওর মত মেয়েরও চোখ ফেটে জল বার হয়েছে!

"আমি আমার মনের কোণে বাঁচবার কোনও ক্ষীণ আশাও দেখতে পাচ্ছিলাম না। তবুও জোর করেই বললাম, 'ইরা, তোর মত মেয়ের এত কাতর হলে চলবে কেন? মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত মনকে দৃঢ় রাখতে হবে আমাদের। আমাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে, বাঁচবার কোনও উপায় মেলে কিনা কোনও দিক থেকে।'

"চলেছি সমানে সোজা গভীর অরণ্যের পথে। ঐ অসভ্য দুটোও চলেছে সঙ্গে সঙ্গে। একটা চলেছে ঠিক আমাদের আগে, আর একটা চলেছে আমাদের পিছনে আমাদের হাতে বাঁধা দড়িটির একপ্রান্ত ধরে। হঠাৎ সামনের লোকটা থমকে দাঁড়াল। কি যেন শুনল কান পেতে। ফিরে তাকাল পিছনের লোকটার দিকে। ওর মুখে বেশ একটি আতঙ্কের চিহ্ন দেখলাম। কি বলাবলি করল ওরা দু'জনে। তারপর তাড়াতাড়ি ওরা যে পথে যাচ্ছিল সে পথ ছেড়ে আমাদের নিয়ে অন্য পথে চলতে লাগল অতি সন্তর্পণে।

"ইরা বলল, 'ছোড়দা, ওরা কিরকম ভয় পেয়েছে, দেখছ? নিশ্চয় ওরা কোনও বিপদের আভাস পেয়েছে!' ফিস্ ফিস্ করেই বললে ইরা।

"আমি বললাম, 'যদিও দৈহিক আকৃতিতে ওরা মানুষ বটে, কিন্তু অন্য সব বিষয়ে পশুদের সঙ্গেই ওদের মিল বেশী। ওদের হয়ত আমাদের মত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশক্তি নেই, কিন্তু ওদের ইন্দ্রিয়শক্তি আমাদের চেয়ে ঢের প্রবল—ঠিক পশুদের মতই। তোর আমার শ্রবণশক্তি, ঘ্রাণশক্তি যেখানে পৌঁছায় না, ওদের

শ্রবণশক্তি, ঘ্রাণশক্তি তার চেয়ে ঢের বেশীদূর পৌঁছায়। তাছাড়াও ওদের একটা জন্মগত ক্ষমতা থাকে—যাকে আমরা বলি ইন্‌স্টিংক্ট—যার দ্বারা ওরা বহু পূর্বে থেকেই বিপদের একটা আভাস পেতে পারে।…যাই হোক, কী ওরা পেয়েছে তা বুঝতে পারছি না—তবে এটা তুই ঠিকই বলছিস্ যে বিপদের আভাস ওরা পেয়েছে।…দেখা যাক, হয়ত ওদের ঐ বিপদ থেকেই আমাদের পরিত্রাণ মিলতে পারে।'

"চলেছি—নূতন পথ ধরে—বেশ খানিকক্ষণ চলেছি।

"হঠাৎ সামনের লোকটা আবার থমকে দাঁড়াল। এবার আর কান পেতে শোনার দরকার হল না। আমরাও এবার স্পষ্ট শুনতে পেলাম—এক সঙ্গে অনেকগুলো কি যেন বাজছে দম্, দম্, দম্…। আর অনেকগুলো মানুষেরও কণ্ঠস্বর যেন ভেসে আসছে কানে। তারা যেন ঐ বাজনার সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে কি একটা বলছে,—ওয়া, ওয়া, ওয়া—লী ; ইয়া, ইয়া, ইয়া—লী ; ওয়ালো, ইয়ালো—উয়ো।

"সেই গভীর অরণ্য ভেদ করে তারা আমাদের দিকেই আসছে মনে হল। এরা আমাদের নিয়ে আবার অন্যপথ ধরল। পথ বললে ভুল হয়—বিপথ বলা উচিত। কারণ এর আগে যে দুটো পথ ধরেছিল ওরা আমাদের নিয়ে তার চতুর্দিক গভীর অরণ্য হলেও, পথ দুটো মানুষ চলে চলে অনেকখানি বেশ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এবার যেখান দিয়ে আমাদের টেনে নিয়ে চলল—সেখান দিয়ে কোন পথ নেই। মানুষের পায়ের চিহ্নও কোনদিন বোধহয় পড়েনি সেখানে। ওদের দেখে মনে হল যে ওরাও জঙ্গলের সে অংশ চেনে না। ওরা যে কোথায় চলেছে তা ওরাও জানে না—বনবাদাড় ভেঙ্গে আমাদের টানতে টানতে নিয়ে ছুটেছে প্রাণের ভয়ে। ইরার আর আমার সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়ে যেত লাগল—সঙ্গে সঙ্গে ওদেরও।

"ইরা বললে 'ছোড়দা, প্রাণ যে যায়! এরা কোথায় টেনে নিয়ে চলল আমাদের? কী হল এদের? ঐ শব্দ শুনে এরা এত ভয় পেল কেন? ও শব্দ কিসের—কারা ওরকম চীৎকার করছে?'

"কথা বলবার সময় তখন নয়। তবুও মাঝে মাঝে তারা যখন থামছিল একটু, তখনই একটু কথা বলার ফুরসৎ পাচ্ছিলাম।

"ইরার কথার উত্তরে বললাম—ওরা বুঝতে পেরেছে যে আর এক বিপক্ষদলের অসভ্যরা আসছে ওদেরই আক্রমণ করবার জন্য। দরকার হলে

ওরা হয়ত যুদ্ধ করবে এদের দলেব সঙ্গে। যুদ্ধের কারণ হচ্ছে বোধহয় আমরাই দু'জন।"

"ইরা অবাক হয়ে গেল, বললে, 'কেন—আমরা কি করলাম?'

"আমি বললাম—'শুনলি না, ঐ ভদ্রলোক বললেন, ওদের ধারণা যে ওদের দেবতার সামনে আমাদের বলি দিলে ওদের জাতির শক্তি বেড়ে যাবে! এসব বৃহৎ অরণ্যবেষ্টিত জায়গায় দু' তিন দল অসভ্য বাস করে অনেক সময়। ওদের মধ্যে সব সময় চলেছে রেষারেষি—যখন-তখন কারণে-অকারণে বাধে তুমুল যুদ্ধ—নৃশংস হত্যাকাণ্ডও চলে। এ-দলেরা আমাদেব হস্তগত করেছে এ খবর হয়ত ও-দলের লোকেরা পেয়েছে। তাই আসছে ওদের কাছ থেকে আমাদের ছিনিয়ে নিতে। এরা দুটোয় যদি আমাদের নিয়ে পালাতে পারে এবং ওদের দলের মধ্যে উপস্থিত হতে পারে তা হলেও নিস্তার নেই। প্রচণ্ড লড়াই শুরু হবে নিশ্চয় দুই দলের মধ্যে। তবে এখন এই দুটোকে যদি ওরা ধরতে পারে তাহলে এদের বর্শার আঘাতে শেষ করে রেখে আমাদের নিয়ে ওরা চলে যাবে।'

"ইরা বললে—'আমাদের ফেলে রেখে এরা দুটো পালাচ্ছে না কেন?'

"উত্তরে বললাম—'আমাদের ফেলে গেলে এদের জীবন যে অন্য দিক থেকে বিপন্ন হবে! এদের দলের লোকেরা এদের প্রাণ নিয়ে নেবে যে!'

"ইরা বললে—'আমাদের তাহলে নিস্তার নেই, যে দলের হাতে পড়ি না কেন বলি আমাদের দেবেই, তা সে যে দলই হোক!'

"চলেছি সমানে ঐরকম ভাবে ওদের টানতে টানতে বন-জঙ্গল ভেদ করে। কিছুদূর যাওয়ার পর সেই শব্দ আর চীৎকার কমে এল অনেকটা, শেষকালে আর শোনাই গেল না।

"এরা এবার যেন একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। আমাদের চেয়ে প্রাণের ভয় যেন এদেরই এখন বেশী।

"এবার এদের একজন আমাদের নিয়ে এক জায়গায় একটু অপেক্ষা করতে লাগল আর অপর লোকটা বনের মধ্যে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বেশ করে দেখে আসতে লাগল কোনও দিক থেকে ওরা আসছে কিনা। ফিরে এসে এটাকে কি বলতে আবার এরা আমাদের নিয়ে কিছুদূব এগিয়ে যেতে লাগল। চলতে লাগল এরা পথ খুঁজে। এদের চলা দেখে বেশ বুঝতে পারলাম যে এই গভীর অরণ্যের এ অংশে কোনদিনই এরা কেউ আসেনি। প্রাণের

ভয়ে শুধু এই অজানা জায়গায় ছুটে এসেছে—এখন পথ খুঁজে পাচ্ছে না ওদের নিজের আস্তানায় পৌঁছুবার।

"চলেছে এই রকম ভাবে। এবারও ঐ আগেকার লোকটা গভীর বনের মধ্যে এগিয়ে গেছে। আমাদের নিয়ে এ লোকটা দাঁড়িয়ে আছে ওর প্রতীক্ষায় অন্যবারেরই মত।...এমন সময় হঠাৎ একটা বিকট চীৎকার কানে এল—তারপর একটা কাতর আর্তনাদ, একটা অতি অস্পষ্ট গোঙানির শব্দ —তারপর সব নিস্তব্ধ। এই লোকটার মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেল। থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগল। ও বোধহয় ভেবেছে যে নিশ্চয় বিপক্ষদলের কেউ অলক্ষ্যে ওদের পিছু নিয়েছে—সেই শেষ করেছে ওর সঙ্গীকে।

"আমাদের ভয় কি? মরণের পথে চলেছে যারা তাদের আবার কিসের ভয়?

"তবুও একটা অজানা দুশ্চিন্তা আছে বই কি—তাই ভাবলাম, কী হলো লোকটার! সত্যিই কি ওদের বিপক্ষদলের কারো হাতে ওর জীবন শেষ হলো! না, অকস্মাৎ অন্য কিছু ঘটল ওর অদৃষ্টে?

"এ লোকটা আমাদের নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে চলল—ওর সঙ্গীর সন্ধানে।"

অজয়ের কথার মাঝে বাধা দিয়ে ললিতা বললেন—"এখন আর নয় অজয়, বেলা প্রায় একটা বাজল। খেয়ে-দেয়ে একটু বিশ্রাম করে নাও। সন্ধ্যার পর আবার শুরু করো—"

অজয় একটু ম্লান হেসে বললে, "আচ্ছা বেশ।"

সকলেই উঠল একসঙ্গে তখনকার মত।

আট

সন্ধ্যাবেলা অজয়কে ঘিরে বসেছে সকলে। অজয় শুরু করল তার গল্প রণজিতেরই ভাষায়—

"ঐ লোকটি আমাদের নিয়ে অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হতে লাগল—যেদিক থেকে তার সঙ্গীর কাতর আর্তনাদ এসে পৌঁছেছিল সেই দিক লক্ষ্য করে। অল্প কিছু অগ্রসর হয়েছি, এমন সময় ইরা বলল—'ছোড়দা, একটা ব্যাপার লক্ষ্য করছ?'

আমি একটু বিস্মিত হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম 'কি ব্যাপার?'

ইরা বললে—'লক্ষ্য করছ না যে বনের এই জায়গাটায় একটা কিরকম থম্‌থমে ভাব—যেন কোন মায়াবীর যাদুমন্ত্রে সবকিছু একেবারে নিঝুম হয়ে গেছে! এতক্ষণ বনের মধ্যে কত জন্তু ছুটোছুটি করছিল, কত পাখী কিচির-মিচির করছিল অথচ এই জায়গাটায় একটি প্রাণীরও দেখা নেই! যেন নিজেদের প্রাণ বাঁচাবার জন্য সভয়ে দূরে পালিয়েছে এই স্থানের ত্রিসীমানা ছেড়ে!'

ইরার কথা সত্যিই। "বনের এই জায়গাটায় এসে সত্যিই মনে হয় যে অতি নিকটেই যেন কোনও এক মহা বিপদ লুকিয়ে অপেক্ষা করছে কাকেও না কাকেও গ্রাস করবার জন্য। যাই হোক, আবও একটু অগ্রসর হলাম আমরা। কিন্তু একটু অগ্রসর হতেই যে দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ল তাতে খানিকক্ষণের জন্য আমরা শুধু বিস্মিত আতঙ্কে চেয়ে রইলাম সেদিকে। আমাদের সঙ্গের ঐ লোকটার মুখের দিকে তাকালে মনে হয়, ও যেন ওর সামনে ভূত দেখেছে! মুখ ওর যেন একেবারে রক্তশূন্য হয়ে গেছে! সমস্ত শরীর ওর কেঁপে কেঁপে উঠছে কী এক নিদারুণ ভয়ে··আমরা দেখলাম, আমাদের সামনে খানিকটা দূরে বটগাছ-জাতীয় প্রকাণ্ড কি একটা গাছ, যদিও সে গাছের উচ্চতা আমাদের দেশের বটগাছগুলির চেয়ে ঢের বেশী। সেই গাছের নীচে চতুর্দিকে জীবজন্তুর কঙ্কাল ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। দেখলে মনে হয় বনের পশুরা এখানে আত্মবলি দিতে আসে সেই দানবের উদ্দেশ্যে; স্বেচ্ছাতেই হোক অনিচ্ছাতেই হোক আসে। হয়ত বছরের পর বছর দিনের পর দিন তারা আসে। তাইতে তাদের দেহের কঙ্কাল সঞ্চিত হয়ে হয়ে আজ ঐ গাছের নীচেটা কঙ্কালেরই ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। শুধু এই দৃশ্যই সব নয়। আমরা দেখলাম সেই গাছটার নীচে এক জায়গায় সেই স্তূপীকৃত হাড়ের উপর ঐ আগেকার লোকটার বিকৃত বিবর্ণ দেহ নিশ্চল হয়ে পড়ে। জীবনের কোন স্পন্দনই নেই ওর দেহে। আমাদের সঙ্গের লোকটা সন্ত্রস্তভাবে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল সেই দিকে। ইরা হঠাৎ চীৎকার করে উঠল, নানারকম ইঙ্গিত করে নিষেধ করল ঐ লোকটাকে ওদিকে যেতে। লোকটা একবার মাত্র ইরার দিকে তাকিয়ে আবার চলল সেই গাছের দিকে তার সঙ্গীর দেহ লক্ষ্য করে। ইরার এই আকস্মিক ব্যাকুলতা দেখে আমি বেশ একটু অবাক্ হয়ে গিয়েছিলাম। ইরাকে জিজ্ঞাসা করলাম—'কি হল ইরা?'

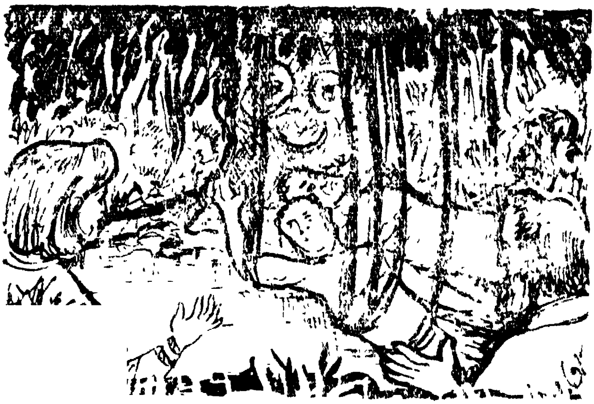
ইরা ব্যাকুলভাবে বললে—'ছোড়দা, ঐ হতভাগ্য লোকটাও এখনই তার জীবন দেবে—ঐ দানবের পায়ের তলায়। ওর দেহেও আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ঐ মৃতস্তূপের অঙ্গীভূত হবে।'

আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না—কাকে ও দানব বলছে? আমি তো আমাদের এই তিনটি মানুষ আর ঐ গাছটি ছাড়া কোন কিছুই দেখছি না। জিজ্ঞাসা করলাম—'দানব কই, দানব কোথায়?'

ইরা তখন একদৃষ্টে চেয়ে আছে ঐ লোকটার দিকে—লোকটা তখন সেই গাছটার নীচে পৌঁছেছে, পৌঁছে দেখছে নেড়েচেড়ে তার সঙ্গীর দেহটাকে। ইরার চোখে-মুখে তখন একটা উদ্বেগ—একটা মহা আশঙ্কার চিহ্ন ফুটে উঠেছে। সে সেই লোকটার দিকেই তার দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বললে—'দানব? দানব ঐ গাছটা। হ্যাঁ, নিশ্চয় ও সেই দানব-বৃক্ষ। ঐ যে দেখছ ঐ গাছটা থেকে বটের ঝুরির মত লম্বা লম্বা দড়ির মত কিসব ঝুলছে, ঐগুলি দিয়েই ও জন্তুদের করে আক্রমণ—একবার যাকে ওর কবলের মধ্যে পায় তাকে নাগপাশে বেঁধে ফেলে ঐ লম্বা দড়ি দিয়ে, তারপর তাকে জড়িয়ে জড়িয়ে'—বলতে বলতে ইরা চীৎকার করে উঠল, 'ঐ দেখ, ঐ দেখ,—উঃ!'

ইরার চীৎকারে সেই গাছটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম এক অদ্ভুত ব্যাপার! ঐ লম্বা লম্বা দড়ির মত সেইগুলি থরথর করে কাঁপছে! তাদের চঞ্চলতা ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। তাদের মধ্যে একটা একবার একটু বেশী জোরেই দুলে উঠল যেন বাতাসের ছোঁয়াচ লাগার ফলেই! পরের মুহূর্তেই সেটা গিয়ে পড়ল ঐ লোকটার পিঠের উপর—ঠিক যেমন করে চাবুক গিয়ে পড়ে ঘোড়ার পিঠের উপর। লোকটা তখনও নিচু হয়ে দেখছিল পরীক্ষা করে তার সঙ্গীর দেহটাকে। অতর্কিতে আক্রান্ত হতেই সে চমকে উঠল—পরের মুহূর্তে সে এক বিকট আর্তনাদ করে উঠল। ততক্ষণ তার ঐ লোহার কঠিন দেহ একেবারে নাগপাশে আবদ্ধ, মাটি থেকে তার দেহ তখন প্রায় বিশ-পঁচিশ ফুট উপরে উঠে গেছে! দড়ির মত সেই আঁকসিটা তার দেহের চারিদিকে পাকিয়ে পাকিয়ে ধরেছে জড়িয়ে—তার নিষ্পেষণে লোকটার মুখে অসহ্য যন্ত্রণার রেখা ফুটে উঠেছে। কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র—সামান্য অস্ফুট কাতর শব্দ; তারপর সব শেষ। বুঝলাম, এখন আর ওর দেহে প্রাণ নেই—ওর প্রাণহীন দেহটাকেই শুধু এখন ঐ দানবটা তার কঠোর নিষ্পেষণে

চূর্ণ করবার চেষ্টা করছে। আরও কিছুক্ষণ কেটে গেল; এ দৃশ্য দেখে আমাদের দেহেও যেন আর জীবনের কোন স্পন্দন রইল না—আমরাও যেন নিশ্চল পাথরের মূর্তিতে পরিণত হয়ে গিয়েছিলাম। আমাদের সংজ্ঞা ফিরে এল হঠাৎ একটা শব্দ শুনে। তাকিয়ে দেখি। ঐ লোকটার প্রাণহীন, বিকৃত পাণ্ডুর দেহ তার সঙ্গীটির দেহের পাশে পড়ে—ঐ দানব তার করাল গ্রাস থেকে ওর দেহকে মুক্ত করে দিয়েছে।



"ইরা অতি আস্তে বললে, 'বেচারা! কত করে বারণ করলাম, কিছুতেই শুনল না। বুঝতেই পারল না হয়ত আমি কি বলছি।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—তুই কি করে জানলি ঐ গাছের কথা?'

ইরা বললে—'আমি ঠিক জানতাম না, তবে ঐ গাছের চেহারা দেখে, ওর ঐ সর্বনেশে দড়ির মত আঁকসিগুলি আর ওর নীচে কঙ্কালের স্তূপ দেখে আমার দৃঢ় ধারণা জন্মেছিল যে এ সেই গাছ। যে গাছের কথা আমি পড়েছিলাম একবার এক উদ্ভিদ্—বৈজ্ঞানিকের লেখা একটা বইএ। তিনি লিখেছিলেন—কেউ কেউ বলেন এই রকম দানব-বৃক্ষের দেখা ক্বচিৎ কখনো মেলে গভীর অরণ্যের মধ্যে। অদ্ভুত এদের প্রবৃত্তি! আমাদের সাধারণ উদ্ভিদ্-জগতে কয়েকটা ছোটখাট গাছ দেখা যায়,—যেমন 'পিচার প্ল্যান্ট' বা 'কলস-বৃক্ষ' 'ড্রসেরা' বা 'রৌদ্রশিশির', ঝাঁঝি—যারা তাদের জীবন-ধারণের জন্য ছোটখাট কীটপতঙ্গ ধরে খায়। কিন্তু এই দানবীয় গাছের ক্ষমতা অসীম —এমন কোনও শক্তিশালী জন্তু নেই এ জগতে যে একবার এর কবলে পড়লে

আর মুক্তিলাভ করতে পারে। অক্টোপাসের মত শিকারকে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে তার শরীরের সমস্ত রক্ত ও রস এরা নির্বিবাদে শুষে নেয়। তারপর বিকৃত দেহটা দেয় ফেলে। ও বেচারা কিংবা ওর দলের কেউ নিশ্চয় কখনও আসেনি এদিকে, নইলে ওদের দু'জনকে আজ এমন দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যে প্রাণ দিতে হত না।'

ইরা কথা বলছিল আমার সঙ্গে, কিন্তু একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল ঐ মৃত লোক দুটির দিকে। ভাল করে ওর মুখের দিকে তাকাতেই দেখি ওর চোখের কোণে জল। আশ্চর্য! ঐ লোক দুটো একটু আগে নিয়ে চলেছিল আমাদের মৃত্যুর মুখে সমর্পণ করতে। আর এখন ওদেরই এই আকস্মিক মৃত্যুতে ইরার চোখে এসেছে জল! মনটা এক মহা তৃপ্তিতে ভরে গেল এই ভেবে যে, নারী যতই শিক্ষিতা হোক, যতই মোটর চালাক, এরোপ্লেন চালাক না কেন, তার অন্তরে যে স্নেহময়ী মন বাস করে তার কখনও মৃত্যু ঘটে না। যাই হোক, একটু প্রকৃতিস্থ হতেই মনে হল যে এখন ওসব ভাবালুতার সময় নয়, এখন আমাদের বাঁচতে হবে। ঐ দানব-বৃক্ষটা হয়ত জন্তুজগতের মহা শত্রু হতে পারে। কিন্তু ও আজ আমাদের পরম মিত্রের কাজ করেছে ঐ বুনো দুটোকে নিপাত করে।...অনেক কষ্টে আমাদের হাতের বাঁধনটা খুলে ফেললাম। তারপর আমি ইরাকে নিয়ে ছুটলাম সে স্থান পরিত্যাগ করে। ইচ্ছাটা আমাদের সমুদ্রতীরে গিয়ে পৌছানো, যদি সেই সাহেবের নৌকোটির দেখা মেলে তাহলে এই বুনোদের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারি! সেই গভীর অরণ্য ভেদ করে বহুক্ষণ এদিক্ ওদিক্ ছোটার পর শেষ পর্যন্ত সমুদ্রের তীরে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম সেই নৌকাটির আশায়। কিন্তু কোথাও তার দেখা মিলল না। সন্ধ্যা হয়ে এল। অন্ধকার আমাদের নিশ্চল করে দিল। দু'জনে সেই সমুদ্রের তীরেই এক জায়গায় শুয়ে পড়লাম রাত্রিটা কোনও রকমে কাটিয়ে দেওয়ার জন্য। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছিলাম যে হয়ত ওদের কেউ মশাল হাতে খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে পড়বে—আবার আমরা ওদের করায়ত্ত হব। কিন্তু যে কারণেই হোক—ওদের কেউ আর এল না সারারাত্রির মধ্যে। ভোর হল ক্রমশঃ। আমরা আবার নৌকাটিকে খুঁজতে শুরু করলাম। আশ্চর্য একটু অগ্রসর হতেই দেখি, এক জায়গায় সাহেবের সেই নৌকাটা কাৎ হয়ে পড়ে। বুকটা আনন্দে ভরে উঠল—ভাবলাম, হয়ত রক্ষা পাব—যদি হঠাৎ কোনও দ্বীপ কিংবা

কোনও যাত্রী-জাহাজের দেখা মেলে। ঐ নৌকায় করে ভাসতে ভাসতে চলি তো আপাততঃ। ভাসলাম অনির্দিষ্টভাবে আবার।"

এ পর্যন্ত বলে অজয় থামল। একটু থেমে বলল—"নিশ্চয় তারা কোনও দ্বীপে গিয়ে পৌঁছেছে, নয়তো কোনও যাত্রী-জাহাজ তাদের উদ্ধার করেছে এতদিনে।"

সকলে নিস্তব্ধ। রণজিতের বাবা আর মা আস্তে আস্তে উঠে চলে গেলেন। যাওয়ার সময় রণজিতের বাবা শুধু আস্তে আস্তে বললেন—"হয়তো তারা বেঁচে আছে, হয়তো একদিন তারা আবার ফিরে আসবে।"

রণজিতের বাবা এবং মা চলে যাওয়ার পর মীরা বললে "অজয়দা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ?"

অজয় উত্তর দিলে—"নিশ্চয়ই।"

মীরা বললে—"তুমি বললে যে রণজিতদার ডায়েরীতে লেখা ছিল তাই তুমি বলছ। বেশ, কিন্তু যখন ওদের বুনোরা ধরে নিয়ে গেল তখন থেকে আর ওদের শেষে সমুদ্রে ভাসা পর্যন্ত রণজিতদা ডায়েরীতে লিখল কি করে ? ও তো আর ওদের এরোপ্লেনের কাছে ফিরে আসেনি !"

অজয় একটু ম্লান হেসে বললে—"ঠিক ধরেছে মীরা। শুধু সন্তান-হারা বাপ-মা ছাড়া এ ত্রুটি এবং আরও অনেক ছোটখাট ত্রুটি সকলের চোখেই ধরা পড়া উচিত। কিন্তু, কি করব ঠিক করতে না পেরে ডায়েরীর আশ্রয় নিয়েছিলাম।" একটু চুপ করে বলল ও—"ডায়েরীর কথা সত্যি নয়।"

অস্ফুট স্বরে ললিতা বললেন—"তবে যা বললে তা সব সত্যি।

তবে আমি সে দ্বীপে কোনদিন যাইনি।"

মীরা বললে—"তবে জানলে কি করে।

অজয় বললে—"রণজিতের নিজের মুখ থেকেই শুনেছি।"

সকলে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল। মীরা বললে—"রণজিতদার সঙ্গে তোমার কোথায়, কিভাবে দেখা হল ?"

অজয় বললে—"সেই কথাই বলছি এবার। সে কথা সন্তান-হারা মা-বাপের সামনে বলা অসম্ভব বলেই বলতে পারিনি।"

নয়

ব্যাকুল আগ্রহে সকলে চেয়ে রইল অজয়ের মুখের দিকে, অজয়ের কিন্তু সেদিকে কোনও লক্ষ্যই ছিল না। তার দৃষ্টি যেন কোথায় কোন মহাশূন্যে নিবদ্ধ; মুহূর্তের জন্য যেন সে আত্মহারা হয়ে পড়েছিল।

হঠাৎ তার জ্ঞান ফিরে এল মীরার ছোট্ট একটি ডাকে—"অজয়দা—"

অজয় চমকে উঠে তাকাল সকলের মুখের দিকে। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস তার বুক থেকে বার হয়ে এল। মীরার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—"হ্যাঁ বলি।" বলে আস্তে আস্তে শুরু করলে সে আবার—

"...গভীর রাত্রি, সমুদ্রের বুকে নেমেছে রাত্রির গাঢ় অন্ধকার। সেই গাঢ় অন্ধকার ভেদ করে সমুদ্রের বুকের উপর দিয়ে চলছিল আমাদের জাহাজখানি। একটু আগে তাকে নোঙর করা হয়েছে, কোথা দিয়ে চলেছি তাও জানি না, আর কোথায় যাব তাও জানি না। গভীর নৈরাশ্যে সমস্ত মন ছেয়ে আছে। বন্ধুর কোনও খবরই পেলাম না—এত প্রচেষ্টা সব ব্যর্থ হয়ে গেল।

"ডেকের উপর একা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম, পাশে এসে দাঁড়াল আমার এ অভিযানের সঙ্গী নির্মল। আশ্চয বন্ধু সে আমার! আমার ঘোরার এই পিছনে আছে নিজের পরম প্রিয় বন্ধুকে ফিরে পাবার এক আকুল বাসনা; দুবার নিয়তিকে জয় করবার আমার তীব্র এক আকাঙ্ক্ষা,—কিন্তু নির্মলের? ওর কোনও উদ্দেশ্যই ত নেই বলতে গেলে, তার নিজের দিক থেকে। শুধু আমার এই দুঃসাহসিক অভিযানে আমাকে তার সাহচর্য দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যই সে ছেড়েছে তার আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব, এমন কি তার নিজের জীবনের মায়া পর্যন্ত!

"নির্মল এসে পাশে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে আমার কাঁধে হাত রেখে বলল,—'অজয়, অনেক রাত হয়েছে, কেবিনে চল, শুয়ে পড়বে।'

ব্যথায় যখন মানুষের বুকটা ভরে থাকে তখন একটু স্নেহের স্পর্শ—মিষ্টি দুটো কথায় মনটা গুমরে কেঁদে ওঠে। মানুষের লৌহ-কঠিন হৃদয়ও কতদূর কোমল হয়ে উঠতে পারে শুধু ব্যর্থতার আঘাতের ফলে—তা বুঝলাম সেদিন। নির্মলের মাত্র ঐ দুটি কথায় আমার মত ছেলের চোখে এসে গেল জল। যেন একটা রুদ্ধ আবেগ আমার বুক ফেটে বাহিরে এসে হাহাকার শব্দে ছড়িয়ে পড়তে চাইল সেই অন্ধকারের বুকে।

"কোনও কথা না বলে ফিরছি ডেক থেকে কেবিনের দিকে—হঠাৎ একটা চীৎকার-ধ্বনি ভেসে এল সেই গভীর অন্ধকার ভেদ করে। দু'জনেই ফিরে দাঁড়ালাম।

"হ্যাঁ, আবার সেই স্বর ভেসে এল কানে। কে যেন ডাকছে অতি কাতরস্বরে চীৎকার করে ডাকছে—'জাহাজে কে আছে, ওগো, জাহাজে কে আছ?"

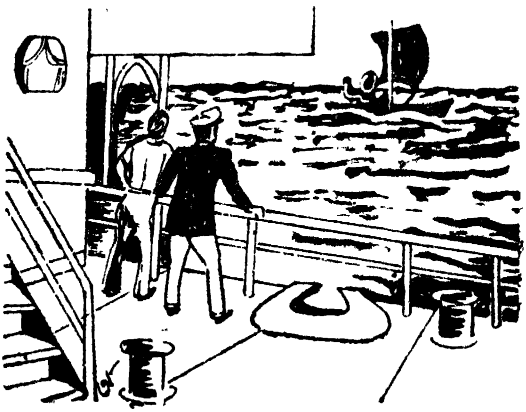
"নির্মল এগিয়ে এল রেলিংএর ধারে, তার পিছু পিছু আমি।

নির্মল চীৎকার করে উত্তর দিল, 'কে ডাকে?'

"আবার সেই স্বর—'জাহাজে কে আছ?'

"নির্মল আবার উত্তর দিলে—'আছি, আমরা আছি। তুমি কে?'

"আর কোন সাড়া নেই; সে স্বর যেন সমুদ্রগর্ভ থেকে উঠে বাতাসে মিলিয়ে গেল। কিন্তু না, কণ্ঠস্বর আর শোনা গেল না বটে, কিন্তু, শোনা গেল আর একটা অস্পষ্ট শব্দ—দাঁড়ের শব্দ,—মানে, কে যেন দাঁড় বেয়ে নৌকা করে আসছে আমাদের দিকে।



"নির্মল ছুটে গিয়ে তার কেবিন থেকে টর্চটা নিয়ে এল। টর্চের আলো সমুদ্রের উপর এক জায়গায় গিয়ে পড়তেই শোনা গেল, কে যেন অত্যন্ত ক্ষিপ্রবেগে দাঁড় টেনে চলে যাচ্ছে দূরে, অনেক দূরে! দূরে চলে গেল ঐ আলো ফেলার জন্যই বোধহয়।

"টর্চের আলোটা ঘুরিয়ে আনবার সময়ে তার আলো গিয়ে পড়ল দূরে কালো মত কি একটা বস্তুর উপর। জলের উপর দিয়ে সেটা চলেছে

নৌকোই বোধ হল। একটু পরেই সেটা টর্চের আলোর সীমার বাইরে চলে গেল।

"নির্মল চীৎকার করে বলল—'এই নৌকায় কে আছে? উত্তর দাও, কে আছ?'

"এবার দূর থেকে অস্পষ্ট স্বর শোনা গেল—'আলো নিভিয়ে ফেল—আলো জ্বাললে আমি যেতে পারব না।'

"নির্মল টর্চটা নিভিয়ে ফেলল। বললে—'এস এইবার এগিয়ে।'

"আবার দাঁড়ের শব্দ দূর থেকে কাছে আসতে লাগল। বেশ স্পষ্ট শুনতে পেলাম আমাদের জাহাজের কিছু দূরে শব্দ হচ্ছে—ছপ্‌ ছপ্‌ ছপ্‌।

"শব্দটা আসল একটুখানির জন্য। সেই স্বর এবার বললে—'শপথ কর আলো জ্বালবে না, তবেই আমি আর অগ্রসর হব।'

"নির্মল যেন হঠাৎ রুখে উঠল—টর্চটা উঁচু করে ধরে জ্বালতে গেল। আমি ওর হাতটা চেপে ধরলাম। শুধু বললাম, 'থাক জ্বেল না—যখন বলছে ও।'

"নির্মল একটু বিরক্তভাবে বললে—'ও বললেই হবে? কেন, আলো না জ্বালার কারণ কী? ওর নিশ্চয় কোনও মতলব আছে'—

"আমার তখন মনটা এতই ভারাক্রান্ত যে কোন কথাই বলতে ইচ্ছা করছিল না। তবু নির্মলকে শান্ত করার জন্য বললাম,—'বদ্‌ উদ্দেশ্য ওর কিছুই নেই, নিশ্চয়। বোধহয় ওদের জাহাজ গেছে সমুদ্রের অতলতলে তলিয়ে—কোনও এক অজানা জায়গায় একাকী হয়ত কাটিয়েছে কতদিন! কিংবা হয়ত ও ছাড়া ওর আর সবাই জাহাজের সঙ্গে সমুদ্রের তলায় সমাধি লাভ করেছে—তাইতে পাগল হয়ে গেছে বেচারা—'

"নির্মল আমার কথা শুনে চীৎকার করে বললে, 'শপথ করছি আলো জ্বালব না! তুমি এগিয়ে এস।'

"আশ্চর্য! কথাটা এতক্ষণ ত আমার মনে আসেনি! একটা অসম্ভব আশা জেগে উঠল মনের মধ্যে। যদি রণজিত হয়,—যদি রণজিত হয়!

"নৌকোটা এগিয়ে আসতে লাগল—রুদ্ধনিঃশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলাম—দূরের ঐ স্বরকে নিকটে পাবার জন্য।

"কয়েক মুহূর্ত মাত্র। নৌকোটা আমাদের জাহাজের অল্প কিছু দূরে এসে থামল। নির্মল জিজ্ঞাসা করল—'কে তুমি?'

"উত্তর এল সে নৌকা থেকে—'ভয় নেই, আমি একজন মানুষ—এক হতভাগ্য বৃদ্ধ'। এবার এত নিকটে, তাই স্পষ্ট শুনলাম সে স্বর। অদ্ভুত সে স্বর, মানুষের স্বর বলে মনে হয় না। কি রকম খস্‌খসে আওয়াজ—অমানুষিক সত্যিই।

"আমার মনের মধ্যে চকিতে যে আশা দেখা দিয়েছিল, মুহূর্তে সে আশা বিলীন হয়ে গেল ঐ কণ্ঠস্বর শোনার সঙ্গে সঙ্গে। শুধু স্বর কেন, ঐ স্বর ত' বললই, ও একজন বৃদ্ধ হতভাগ্য লোক। রণজিত্‌-এর দেখা মিলবে না আর কোনও দিন।

"নির্মল ওর সঙ্গে কথা বলতে লাগল। ও বললে···'বেশ ত' মানুষ যদি হও, তা হ'লে আলো জ্বালতে বারণ করছ কেন?'

"সেই স্বর উত্তর দিলে···'আলো জ্বালতে বারণ করছি···তার কারণ···তার কারণ···' সে যেন আর বলতে পারল না; মনে হল সে যেন ভেঙ্গে পড়ল একেবারে।

"নির্মল বললে···'আশ্চর্য ব্যাপার! প্রথমতঃ আলো জ্বালতে বারণ করলে; তারপর কেন বারণ করলে তাও বললে না। এই অন্ধকার রাত্রে হঠাৎ কোথা থেকে তুমি এলে তাও জানি না, তোমার কোনও অসৎ উদ্দেশ্য আছে কিনা তাই বা জানব কী করে? তুমি ত বললে যে নৌকোয় তুমি মাত্র একজন আছ···কী করে বুঝব আমরা সে কথা সত্য কিনা যদি না দেখতে পাই তোমাকে—আর এই গাঢ় অন্ধকারে আলো না ফেললেই বা দেখব কি করে তোমাকে?'

"আবার ছপ—ছপ শব্দ শোনা গেল জলের মাঝে। দূরে চলে যাচ্ছে সে তার নৌকো নিয়ে। একটু পরে শোনা গেল সে স্বর বলছে—'বড় দুঃখিত, আমি সত্যিই বড় দুঃখিত। তোমাদের কোন অসুবিধা বা অসন্তোষের কারণ হওয়ার আমার ইচ্ছা ছিল না। কেবল দুর্দান্ত ক্ষুধার অসহ্য যন্ত্রণায় এসেছিলাম তোমাদের কাছে। বিশেষতঃ আর একজন নারী—'

"কি করুণ নৈরাশ্যপূর্ণ সে স্বর! ব্যথায় আর যন্ত্রণায় যেন ফেটে পড়ছে মনে হলো।

"নির্মলের মনও এবার সহানুভূতিতে ভরে উঠছে। সে চেঁচিয়ে বললে—'এই, শোন। তোমাকে তাড়িয়ে দিতে আমি চাইনি। আলো আমরা জ্বালব না—তুমি কাছে এস, তোমার যা দরকার তা নিয়ে যাও।'

"আবার ধীরে ধীরে নৌকোটা ফিরে এল—বুঝলাম ফিরে এসে এবারও জাহাজ থেকে সে বেশ খানিকটা দূরে থামল।

"নির্মল বললে—'তুমি আরও কাছে আসছ না কেন? জাহাজের একেবারে ধারে এস, তোমার দরকার মত খাবার নিয়ে যাও।'

"সেই স্বর অত্যন্ত ভীত ও ব্যথিত ভাবেই বললে,—'কাছে যাওয়ার আমার উপায় নেই, সাহস হয় না আমার—'

"নির্মল হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে—'একজন নারীর কথা বলছিলে—তিনি কি তোমার ঐ নৌকোতেই—?'

"সে উত্তর দিলে—'না, তাকে দ্বীপে রেখে এসেছি।'

"নির্মল বললে—'কোথায় সেই দ্বীপ? কী নাম তার?'

'সে দ্বীপের নাম জানিনে'—উত্তর দিল সে স্বর।

"নির্মল বললে—'তাকে কি এখানে আনা যায় না?'

"সেই স্বর এইবার বেশ ক্ষুব্ধ এবং বিরক্তভাবেই উত্তর দিলে—'না, তাকে আনা যায় না। আনা সম্ভব নয়। তাকে এখানে নিয়ে আসবার বন্দোবস্ত করতে তোমাদের কাছে আমি আসিনি—এসেছিলাম কিছু খাদ্য-সংগ্রহের জন্যে। একটি নারী ক্ষুধার যন্ত্রণায় মৃতপ্রায় আর এই সময়—'

"নির্মল তার কথায় বাধা দিয়ে বললে—'সত্যই আমি পশু!' বলে সে ছুটল জাহাজের ভিতরে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে ফিরে এল—হাতে তার নানা প্রকারের আহার্য বস্তু।

"সে এবার অতি মিষ্ট করেই বললে,—'জাহাজের পাশে না এলে কি করে দিই? একবারটি কাছে এস—একবারটি।'

"সে অতি কাতরস্বরে বললে—'উপায় নেই, উপায় নেই।'

"আমার মনে হল, লোকটির মনে অদম্য আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও কি একটা বিশেষ ভীতপ্রদ কারণে সে জাহাজের কাছে আসতে পারছে না। যে খাবারের অভাবে সে নিজে এত কাতর আর তারই কোনও আত্মীয়া মৃতপ্রায় হয়ে ধুঁকছে নিকটেই কোনও একটা দ্বীপে, সেই খাবার নেবার জন্য সে কাছে আসতে পারছে না! আমার মধ্যে থেকে কে যেন বলে দিল পাগল ও নয়। সত্যিই কোন দুর্ভাগা ক্ষুধার তাড়নায় ছুটে এসেছে কিন্তু সে ক্ষুধার অসহ্য যন্ত্রণার চেয়েও ওর জীবনে চলছে আর এক ভীষণতর বিভীষিকার নিষ্ঠুর পরিহাস, যার ভয়ে সে এই অসহ্য ক্ষুধার মুখে আহার্য বস্তুর সন্ধান পেয়েও তা নেওয়ার জন্য জাহাজের

কাছে আসতে সাহস করছে না। আমি এতক্ষণ চুপ করেই ছিলাম। এবার অতি আস্তে নির্মলকে বললাম—'একটা বাক্স নিয়ে এস চট্ করে, তারপর ঐ লম্বা 'রড'টার মাথায় দড়ি দিয়ে বেঁধে নামিয়ে দাও।' নির্মল আমার কথামত কাজ করলে। একটা বাক্স জোগাড় করে তার মধ্যে সমস্ত খাবার জিনিসগুলি ভর্তি করলে,—তার পর ঐ রডের মাথায় দড়ি দিয়ে বাক্সটা বেঁধে অন্ধকারের মধ্যে আন্দাজে নামিয়ে দিল। বললে শুধু—'ধর নামিয়ে দিয়েছি বাক্স করে।'

"একটা অস্ফুট হর্ষসূচক শব্দ শোনা গেল সেই নৌকো থেকে।

"কয়েকটি মুহূর্তমাত্র।—আবার ছপ্ ছপ্ ছপ্ শব্দ শোনা গেল জলের মধ্যে। নৌকা বেয়ে চলে গেল সে ক্ষীপ্রবেগে।

"যাওয়ার সময় শুধু বললে—'কী বলব! ভগবান তোমাব মঙ্গল করুন।"

"নির্মল একটু হেসে বললে—'প্রয়োজন মিটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরে পড়ল, মজা দেখেছ?'

"আমি বললাম —'ভুলে যাচ্ছ কেন নির্মল, যে আর একজন ওর পথ চেয়ে জীবনের শেষ মুহূর্তক'টি গুণছে; ও নিশ্চয়ই আবার আসবে ফিরে, দেখো।'

"বুকটা আমার মুচড়ে উঠল। ইরা মায়ের কত আদরিনী মেয়ে সেও হয়ত এমনি করে অনাহবে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে তিল তিল করে মরেছে —রণুও গেছে তার সঙ্গে নিশ্চয় মবণের সাথী হয়ে।

"এক ঘণ্টা কেটে গেছে, দু'ঘণ্টা গেছে, বোধহয় তিন ঘণ্টাও কাটে—কে জানে?

"নির্মল সমানে দাঁড়িয়ে আছে আমার পাশে। এই অস্বাভাবিক ঘটনাটা ওর মনকে বেশ নাড়া দিয়েছে মনে হল।

"দু'জনে নীরবে দাঁড়িয়ে আছি অন্ধকার সমুদ্রের বুকে দৃষ্টি ফেলে। হঠাৎ দূরে শব্দ শোনা গেল—ছপ্ ছপ্ ছপ্।

"নির্মল বললে—'অজয়, সত্যিই সে আসছে।'

"অনেকক্ষণ পরে শুনলাম সেই স্বর বলছে—'আলো জ্বালা নেই ত?'

"নির্মল বললে—'না।'

"সে এবার আগের মত কাছে এসে অল্প দূরে থামল, তারপর বললে—'কী উপকার যে করলে আমাদের তোমরা আজ—'

"নির্মল তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশে বাধা দিতে গেল। সে সেই বাধা না মেনে বললে, 'তোমরা কল্পনাই করতে পার না যে কী যন্ত্রণা পাচ্ছিল সে খেতে

না পেয়ে। তোমাদের দেওয়া খাবার পেয়ে ক্ষুধার সেই দারুণ যন্ত্রণা থেকে সে পেয়েছে নিষ্কৃতি!'

"সে বলে চলল—'আজ যখন এইরকম অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা পেয়েছি মানুষের তখন তাদের শুনিয়ে দেওয়া উচিত আমাদের এই অভাবনীয় দুর্ভাগ্যের কথা। হয়তো কোনও দিন তোমাদের কাছ থেকে সে কথা শুনতে পাবে তারা, যারা আমাদের পথ চেয়ে বসে আছে। তাই তোমাদের বলতে এলাম আমাদের দুর্ভাগ্যের কাহিনী।'

"নির্মল বললে—'তারা কারা?'

"সেই স্বর বললে—'সেই কথাই বলছি এবার শোন।'

শুরু করলে সে—

"কলকাতা থেকে এরোপ্লেনে চড়ে বার হই, সঙ্গে আমার একমাত্র বোন ইরা—

"কে যেন আমার কানের মধ্যে তপ্ত লৌহশলাকা প্রবেশ করিয়ে দিল, বলে উঠলাম—'রণজিত—রণু তুমি!'

"অস্ফুট এক আর্তনাদ ভেসে এল সেই নৌকোর মাঝ থেকে—'অ-জ-য়!'

"মুহূর্তের জন্য আমার বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে গিয়েছিল। কয়েক মুহূর্ত পরে যখন জ্ঞান ফিরে এল তখন বুঝলাম সে অনেকখানি দূরে চলে গিয়েছে।"

দশ

অজয় বলে চলল—"আমি পাগলের মত চীৎকার করে উঠলাম, 'রণু, আমি সত্যিই অজয়—রাতদিন ধরে ঘুরছি তোমারই সন্ধানে। আজ এত আকস্মিক ভাবে দেখা পেলাম তোমার অথচ তোমাকে কাছে পাব না? ফিরে এস, ফিরে এস রণু!'

দূর, অতি দূর থেকে রণজিতের কণ্ঠস্বর ভেসে এল—কান্নার সুরে ভরা সে স্বর—সে বললে, 'অজয়, উপায় নেই, উপায় নেই তোমাদের কাছে যাবার যে দুর্ভাগ্য আজ ঘিরেছে আমাকে আর তোমাদের সকলের অত আদরের ইরাকে—সে দুর্ভাগ্য পাছে আবার তোমাদের ঘিরে ধরে, সেই ভয়ে তোমাদের অতি কাছে যেতে সাহস পাচ্ছি না। তাছাড়া আমার চেহারা যদি তুমি দেখ তাহলে,—তাহলে—'

বাধা দিয়ে বললাম—'কাছে এস রণু—যেমন আগে এসেছিলে।'

রণু বললে—'কথা দাও কিছুতেই আলো জ্বালবে না কিংবা আমাকে ফিরে পাওয়ার জন্য কোন চেষ্টা করবে—'

"চোখ আমার জলে ভরে এল; বাধ্য হয়ে বললাম, 'কথা দিচ্ছি।'

দাঁড়ের শব্দে বুঝলাম তার নৌকো নিয়ে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। নির্মল স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। সে শুধু নির্বাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইল আমার পাশে। ক্রমশঃ রণুর নৌকা এসে আগের মত আমাদের জাহাজের অল্প দূরে থামল। নৌকো থেকে রণু ডাকলে—'অজয়!'

অতি আস্তেই তাকে উত্তর দিলাম।

রণু বললে—'অজয়, আজ আর আমাদের ফিরে যাওয়ার কোন উপায় নেই। কেন, সেই কথাই বলছি। তোমাদের সকলেরই ধারণা আমরা হয়ত আর বেঁচে নেই। সে ধারণা যে তোমাদের ভুল, তাতো দেখছই। কিন্তু এ বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু ছিল আমাদের কাছে শতগুণ শ্রেয়ঃ। মৃত্যুর সামনা-সামনি বার কয়েক আমরা দাঁড়িয়েছিলাম, কিন্তু মৃত্যু তখন গ্রাস করেনি আমাদের। কেন তা করবে? মৃত্যুর চেয়ে ভয়ঙ্কর অবস্থা যে রয়েছে আমাদের অদৃষ্টে লেখা। যাই হোক শোন'—

অজয় একটু থেমে সকলের দিকে তাকিয়ে বললে, "এরপর রণু বলে গেল তাদের অভিযানের সবিস্তৃত কাহিনী যা আমি এতক্ষণ ডায়েরীর লেখা বলে এসেছি তারপর থেকে ও যা বলল সেইটুকুই বলছি—

"রণু বলতে লাগল—'সেই ছোট নৌকোখানি করে ভাসলো তারা। অনির্দিষ্ট ভাবে দাড় চালাতে লাগল। রাত্রির অন্ধকার গেল কেটে, কিন্তু দৃষ্টি আমাদের পথ খুঁজে পেল না কোন দিকে। দৃষ্টির পথ রোধ করে রয়েছে কুয়াশা একটুও কমেনি। দু'দিন তিন দিন চললাম কুয়াশার মধ্যেই। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় শরীর অবশ হয়ে আসছে। ইরা ত' নৌকোর একদিকে মৃতপ্রায় অবস্থায় পড়ে আছে। মাঝে মাঝে সন্দেহ হচ্ছে ও বুঝি মরেই গেছে। যাক চতুর্থ দিন, রাত্রি তখন গভীর, শুনলাম সমুদ্রের ঢেউ যেন আছড়ে পড়ছে সমুদ্রের তটের উপর। অভূতপূর্ব আনন্দে বুকটা ভরে গেল—তাহলে তীরে পৌছেছি, হয়ত—হয়ত কেন, নিশ্চয়ই কোনও লোকালয়ের দেখা মিলবে; সেখানকার লোকদের কাছে আহার্য পাব, পাব তৃষ্ণার জল; বোধ হয় বেঁচে গেলাম—ইরাকে বোধহয় বাঁচাতে পারব। রাত্রির অন্ধকারে দেখতে পেলাম না কিছু; তবে দেখলাম আমাদের নৌকোখানা বার

কয়েক ওঠা-নামা করল ঢেউয়ের ধাক্কায়—তারপর ভাসতে লাগল স্থির জলরাশির বুকে।

"ভোর হল,—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার লোকালয়ের দেখা পাওয়ার আশাও ভেঙে গেল যখন দেখলাম কোথাও লোকালয়ের চিহ্ন নেই। শুধু এক বিরাট অরণ্যভূমি সামনে রয়েছে বিস্তৃত। যাক নিশ্চিন্ত হলাম মৃত্যু সম্বন্ধে। অনাহারেই মৃত্যুই হল তাহলে আমাদের শেষ পরিণতি!

"কিন্তু না, মুহূর্ত কয়েক মাত্র। মরতে হল না। দূরে একটা জাহাজের অংশ দেখা যাচ্ছে বোধ হল। একটু এগুতেই দেখি সত্যিই একখানি প্রকাণ্ড জাহাজ। আশ্চর্য মানুষের আশা—আবার আমার বাঁচবার আশা জেগে উঠল মনের মধ্যে।

"নৌকো নিয়ে এগিয়ে গেলাম জাহাজটির কাছে। চীৎকার করে ডাকলাম জাহাজের লোকদের। কত অনুরোধ করলাম আমাদের জাহাজে তুলে নেওয়ার জন্যে। কিন্তু কোন উত্তরই এল না। নৌকোটা এবার নিয়ে এসে একেবারে জাহাজের গায়ে লাগালাম! একটা দড়ি ঝুলছিল জাহাজ থেকে, সেইটা ধরে উঠলাম জাহাজের উপর, উঠলাম মানে অতিকষ্টে উঠলাম—কারণ ঐ দড়িটাতে একরকম ধূসর রংএর 'ফাংগাস'—বাংলায় যাকে বলে 'ছত্রাক' সেই ফাংগাস গজিয়াছে। শুধু দড়িটা কেন—জাহাজের গা'টাই ভরে গেছে ঐ ফাংগাসে। যাক, কোনও রকমে জাহাজের রেলিং টপকে ত জাহাজের ডেকের উপর এসে উপস্থিত হলাম। আশ্চর্য, জাহাজের ডেকগুলিও জায়গায় জায়গায় ঐ ফাংগাসে ভর্তি হয়ে আছে—শ্যাওলা ধরার মত। কোনও কোনও জায়গায় আবার বেশ কয়েক ফুট উঁচু পর্যন্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু তখন সেদিকে লক্ষ্য করবার আমার সময় ছিল না, আমি শুধু ভাবছি জাহাজে কোনও লোক আছে কি না! চীৎকার করে ডাকলাম—একবার দু'বার তিনবার। কোনও উত্তর নেই। 'পুপ ডেক'-এর নীচে যে একটা দরজা ছিল, সেইটার কাছে গিয়ে সেটা খুলে ফেললাম। উঁকি মেরে ভেতরে দেখবার চেষ্টা করলাম। একটা সোঁদা ভ্যাপসা গন্ধ এসে লাগল নাকে। দরজাটা তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিলাম। ভাবলাম, কোনও মানুষ, কেন, কোনও প্রাণীরই থাকা সম্ভব নয় এর মধ্যে! বুঝলাম, কেউ নেই এই জাহাজে। হঠাৎ কি রকম একটা শিহরণ খেলে গেল আমার সমস্ত শরীরের ভিতর দিয়ে। হঠাৎ মনে হল আমি একা—ভীষণ রকমের একা।…যেখান

দিয়ে উঠেছিলাম ছুটে গেলাম সেই জায়গাটায়।···দেখলাম আমার আদরের বোনটি তখনও বসে আছে চুপটি করে নৌকোর একপাশে। আমি তাকাতেই সে বললে শুধু, অতি আস্তে—'কারো দেখা পেলে ছোড়দা ?'

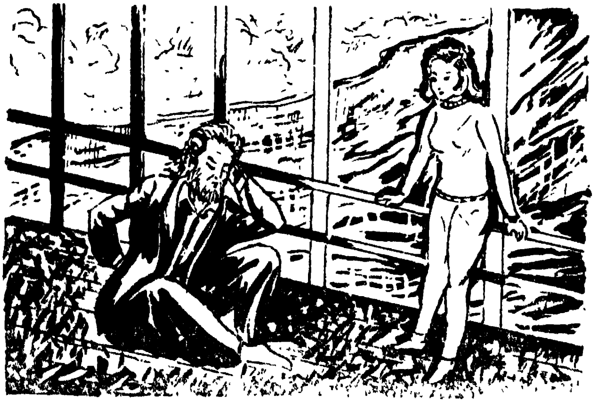
আমি বললাম,—'না রে, জাহাজে কেউ নেই··মনে হচ্ছে অনেকদিন এ জাহাজে কোনও লোকজনের বসবাস নেই। যাই হোক, তুই আর একটু অপেক্ষা কর,—আমি একবার দেখে আসি মই-টই ধরনের কিছু পাই কিনা যাতে করে তুই উপরে উঠে আসতে পারিস। তুই উঠে এলে, দু'জনে মিলে আর একবার সমস্ত জাহাজটা তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখব সত্যিই জাহাজ একেবারে জনশূন্য কিনা।'

একটু খুঁজতেই জাহাজের একপাশে একটা দড়ির মই পড়ে রয়েছে দেখলাম। সেইটা নিয়ে এসে ঝুলিয়ে দিলাম নৌকো পর্যন্ত। ইরা উঠে এল সেই দড়ির মইএ চড়ে। অত ক্লান্ত ক্ষুধা তৃষ্ণায় ক্লিষ্ট ওর শরীর, তবুও উঠে এল ও সোজা ডেকের উপরে। দু'জনে মিলে নতুন করে খুঁজতে শুরু করলাম প্রত্যেক কেবিনে—প্রত্যেক জায়গায়। কারো দেখা মিলল না, শুধু দেখা মিলল ঐ 'ফ্যাংগাস'-এর ঐ—অদ্ভুত 'ফ্যাংগাস'-এর যা সমস্ত কেবিন ও অন্যান্য কামরার দেওয়াল ও মেঝের জায়গায় জায়গায় ছেয়ে ধরেছে। আমার কি রকম করতে লাগল গায়ের মধ্যে ঐগুলো দেখে। ইরাকে বললাম, 'দেখছিস্ ইরা কি বিশ্রী এইগুলো।'

ইরা একটু হেসে বললে—'ওদের ওপর অত বিরক্তির কারণ কি? কী শত্রুতা করলো ওগুলো তোমার সঙ্গে? ওগুলো ত' আর আমাদের কোনও অনিষ্ট করছে না! পরিষ্কার করে ফেললেই হবে পরে ওগুলোকে।'

যাই হোক—জাহাজের এদিক ওদিক দেখে যখন শেষ পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হলাম যে জাহাজে কেউ নেই তখন নিজেদের বাস এবং আহারের চেষ্টায় নিযুক্ত হলাম। দুটো কেবিন পরিষ্কার করে নিলাম প্রথমে। তারপর শুরু করলাম খাদ্যান্বেষণ। ঈশ্বরকে বহু ধন্যবাদ—খাবার মিলে গেল; তার সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার পানীয় জলও যদিও একটু বিস্বাদ হয়ে গেছে সে জল। একটা দিন একটু বিশ্রাম করে পরের দিন লেগে গেলাম সমস্ত জাহাজ পরিষ্কার করতে, যাতে সেটা বাসযোগ্য করে তোলা যায়। কিন্তু পরিষ্কার করা যত সহজ ভেবেছিলাম তত সহজ নয় দেখলাম। সেই অদ্ভুত 'ফ্যাংগাস'গুলোকে ত' প্রথম দিন বেশ করে চেঁচে পরিষ্কার করে দিলাম—কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টাও

কাটেনি বোধহয়, সেইগুলি আবার আগেকার মত ছেয়ে ফেলেছে সেই জায়গাগুলি। আবার পরিষ্কার করলাম—পরের দিন আবার ঠিক যেমন ছিল তেমনি। অত্যাশ্চর্য ঘটনা এ যে!–ভৌতিক ব্যাপার নাকি কিছু? ইরার মুখ শুকিয়ে গেছে। সামান্য ফ্যাংগাস' বলে সেও আর হেসে উড়িয়ে দিতে পারছে না এখন আর। তবুও দমলাম না। জাহাজে ঘুরতে ঘুরতে



চোখে পড়ল এক জায়গায় একটা কার্বলিক য়্যাসিডের টিন—একেবারেই য়্যাসিড ভর্তিই রয়েছে। সেইটা নিয়ে এসে ইরাকে দেখিয়ে বললাম—'ইরা, ঈশ্বর মিলিয়ে দিয়েছেন ঐ হতভাগা ফ্যাংগাস'গুলোকে মারবার উপায়!' ইরা জিজ্ঞাসা করলে—'কী আছে ওতে?'

"উত্তর দিলাম, – 'কার্বলিক য়্যাসিড।'

তারপর লেগে গেলাম আবার সেগুলোকে চেঁচে পরিষ্কার করতে। পরিষ্কার করার পর যে জায়গায় ওগুলো জন্মেছিল সেই জায়গাগুলোতে বেশ করে কার্বলিক য়্যাসিড ছড়িয়ে দিলাম। একদিন যায় দুদিন যায়—ভাবলাম, না, এবার শেষ হয়ে গেছে ওদের। কিন্তু, সপ্তাহখানেকের মধ্যে আবার দেখা দিল তারা পূর্ণোদ্যমে—শুধু তাই নয়, এবার আবার যে জায়গায় 'ফ্যাংগাস' ছিল না সে জায়গাগুলোও ছেয়ে ফেলেছে! আমরাই বোধহয় ওদের গায়ে হাত দিয়ে জাহাজের সর্বত্র সংক্রামিত করলাম ঐ অদ্ভুত 'ফ্যাংগাসগুলিকে। আমরা হতাশ হয়ে পড়লাম ওদের বিনাশ-সাধন সম্বন্ধে। ঠিক করলাম,—যতদিন না উদ্ধারের কোনও উপায় মেলে ততদিন কাটাতে হবে কোনওরকমে এই ফ্যাংগাস-এর মধ্যেই।"

এগার

ঘরের মধ্যে সকলের মুখেই ফুটে উঠল একটা ভয়ার্ত ঔৎসুক্য। অজয় বলতে লাগল রণুরই ভাষায়—

"ইরার বালিশের দিকে তাকিয়ে আমার সমস্ত শরীর শিউরে উঠল। কি সর্বনাশ, ওর বালিশ বিছানা পর্যন্ত আক্রমণ করেছে ঐ ফ্যাংগাস! বালিশের গায়ে চাদরের কোণে কয় জায়গায় ঐ কুৎসিত ফ্যাংগাস গজিয়ে উঠেছে।

বললাম ইরাকে—'আর নয় এ জাহাজে। চল্, এক্ষুনি জাহাজ থেকে নেমে তীরের চতুর্দিক খুঁজে দেখি, একটু নিশ্চিন্ত মনে বাস করতে পারি এমন জায়গা পাওয়া যায় কিনা।'

"সঙ্গে নেওয়ার জন্য আমাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় কয়েকটা জিনিস একত্র করলাম; কিন্তু তার মধ্যেও দেখি ফ্যাংগাস আশ্রয় গ্রহণ করেছে। ইরাকে না দেখতে দিয়েই যেগুলিতে ফ্যাংগাস জন্মেছিল সেগুলি ফেলে দিলাম ছুঁড়ে জলের মধ্যে।

"আমাদের নৌকাখানি তখনও জাহাজের ধারেই ছিল। আমি ইরাকে নিয়ে অতি কষ্টে নেমে এলাম সেই নৌকাটির মাঝে।

"তীরের দিকে নৌকা চালালাম। কিন্তু তীরে পৌছে আমাদের সব আশা নির্মূল হয়ে গেল। সমস্ত তীর ঐ ফ্যাংগাসে ভর্তি—যেদিকে তাকাই সেই দিকেই ঐ শয়তানের রাজত্ব। যে ফ্যাংগাসের ভয়ে এলাম জাহাজ থেকে পালিয়ে এখানে, এসেও সেই ফ্যাংগাস। জাহাজে তবু তারা ছিল আকৃতিতে ছোট, কিন্তু এখানে তারা বেড়ে উঠেছে কী প্রবলভাবে! এতবড় হয়ে তারা বেড়ে উঠেছে যে বাতাসে যখন তারা নড়ে উঠছে তখন মনে হচ্ছে যেন ওরাও কোনও জীবন্ত প্রাণী। কি বীভৎস তাদের চেহারা! কোথাও লম্বা উঁচু হয়ে উঠেছে—কোথাও বা ছড়িয়ে রয়েছে সমস্ত জমি জুড়ে ঘাসের চামড়ার মত।...মনে হয়, সমস্ত জায়গাটা যেন ঐ ফ্যাংগাসের কবলে আত্মসমর্পণ করে নির্জীব হয়ে পড়ে আছে। ওখানকার গাছগুলো পর্যন্ত বাড়তে পায়নি—ফ্যাংগাসে তাদের সর্বাঙ্গ ধরেছে।

মনে হল প্রথমটায়, এই সমুদ্রতীরে বোধহয় এমন এক ইঞ্চি পরিমাণ জায়গা নেই, যেখানে ফ্যাংগাসে তার করাল গ্রাস বিস্তার করেনি। কিন্তু শেষকালে দেখলাম, আমাদের সে ধারণা ভুল। কারণ, আর একটু অগ্রসর

হতেই চোখে পড়ল, সমুদ্রের তীরে একটা সাদা জায়গা ফ্যাংগাস-মুক্ত। কাছে গিয়ে দেখলাম জায়গাটা বালিতে ভর্তি, আমরা ঐ জায়গাতেই নৌকো বেঁধে নেমে পড়লাম। আশ্চর্য, যখন নামলাম সেই জায়গায় তখন দেখলাম, যেগুলিকে বালি মনে করেছিলাম সেগুলি বালি নয়। কিন্তু সেগুলি যে কী তা বুঝতে পারলাম না। তখন আমাদের অবস্থা যা তাতে গবেষণা করবার সময় নয়। জায়গাটা ফ্যাংগাসের আক্রমণের বাইরে,—এইটুকু আমাদের জীবনে সবচেয়ে আনন্দের কথা। ফ্যাংগাসে-ঘেরা কুৎসিত বিস্তৃত বনভূমি, ধূসর রংএ ছেয়ে গেছে চতুর্দিকে; কেবল তারই মাঝে মাঝে খানিকটা সরু ফালি জমি চলে গিয়েছে এদিকে ওদিকে। যেখানে ফ্যাংগাস পারেনি তার অধিকার বিস্তার করতে; সেই জায়গাগুলি ঐ বালির মত পদার্থে ভর্তি।

"যাই হোক, সেই জায়গাটুকু পেয়ে তখন যে আমাদের কী আনন্দ হল তা বলে মানুষকে বোঝান যায় না। আমাদের জিনিসপত্র সব আমরা সেখানেই নামালাম। তারপর আবার গেলাম জাহাজে ফিরে, আরও কতকগুলি দরকারী জিনিস নিয়ে এলাম জাহাজ থেকে। আর, হ্যাঁ, জাহাজ থেকে আসবার সময় জাহাজের একটা পালও নিয়ে এলাম। সেই পাল দিয়ে কোনও রকমে চলনসই দুটো তাঁবু তৈরি করে ফেললাম দু'জনে মিলে। এর মধ্যেই আমাদের জিনিসপত্র রেখে আমরা বসবাস করতে লাগলাম—অবশ্য দৃষ্টি পড়ে রইল সমানে আমাদের দূর সমুদ্রের বুকে যদি কোনও জাহাজের দেখা মেলে। এমনি করে কাটল চার সপ্তাহ এই নির্জন দ্বীপের মধ্যে। অন্যের কাছে হয়ত মনে হবে, কী দুঃখ আর হতাশার মধ্যে দিয়েই কাটছিল আমাদের সময়। না অজয়—অন্তত পক্ষে তখন ক'টা দিন খুব খারাপ ভাবে কাটেনি। কি জানি কেন তখন আমাদের দু'জনের মনেই কোথা থেকে এক আশা এসে বাসা বেঁধেছিল যে নিশ্চয় শীঘ্রই কোনও যাত্রী জাহাজের বা মালবাহী জাহাজের দেখা আমাদের মিলবে—পরিত্রাণ আমরা নিশ্চয়ই পাব এই কুৎসিত ফ্যাংগাসের রাজত্ব থেকে। তাই কাটল ক'দিন দুই ভাইবোনে হাসি—তামাসা গল্প-গুজব করে—

"রণজিত একটু থেমে আবার বলতে লাগল। গলার স্বরে তার ব্যথার আমেজ—'আমাদের সব হাসি জন্মের মত শেষ হয়ে গেল সেদিন সকালে।

"ইরা আস্তে আস্তে এসে আমার কাছে দাঁড়িয়ে বলল 'ছোড়দা দেখছ ?' —বলে তার ডান হাতের বুড়ো আঙুলটি তুলে দেখাল আমাকে।

"তার বুড়ো আঙুলের মাথায় ছোট্ট একটি আঁচিলের মত আকার নিয়ে জন্মেছে ফ্যাংগাস!

"আমার মনে হল মুহূর্তের মধ্যে যেন শরীরের সমস্ত রক্তস্রোত বন্ধ হয়ে গেল। আকুল ভাবে তাকালাম ইরার মুখের দিকে। সে মুখে ভীতির লেশমাত্র নেই—চিন্তার কোনও রেখা পর্যন্ত ফোটেনি তার মুখের কোনও-খানে। অদৃষ্টের হাতে সে যেন আত্মসমর্পণ করে নির্বিকারত্ব লাভ করেছে।

"যাই হোক দু'জনে মিলে জল আর কার্বলিক য়্যাসিডের সাহায্যে পরিষ্কার করে ফেললাম ওর আঙুলের সে জায়গাটা। পরদিন সকালে দেখি আবার ঠিক সেই জায়গায় সেটা বার হয়েছে।

"কারো মুখে কোনও কথা বার হল না। নীরবে শুধু দু'জনের মুখের দিকে দু'জনে তাকিয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। একটু পরে আবার নীরবে শুরু করলাম সেটাকে পরিষ্কার করতে।

"হঠাৎ ইরা চীৎকার করে উঠল—'ছোড়দা, তোমার মুখের পাশে ওটা কী ?' ওর গলার স্বর এবার কিন্তু মহা উৎকণ্ঠায় ভরা।

"আমি হাত দিয়ে অনুভব করবার চেষ্টা করলাম।

"ইরা ব্যস্ত হয়ে বললে—'ঐ যে, তোমার কানের পাশে—ঠিক চুলের নীচে। আর একটু—আর একটু—আর একটু সরে, হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

"আমার আঙুল ঠেকল এবার ঠিক জায়গায়। বুঝলাম, আমাকেও ধরেছে।

"আমি বললাম—'আচ্ছা, আগে তোর আঙুলটা পরিষ্কার করে দিই। যতক্ষণ ওর আঙুল পরিষ্কার না হয় ততক্ষণ আমাকে ছুঁতে বোধহয় ও ভয় পাচ্ছিল। আমি ওর আঙুল পরিষ্কার করে দেওয়ার পর ও আমার মুখের যে জায়গাটায় ঐ কুৎসিত ফ্যাংগাস বার হয়েছিল সেখানটা পরিষ্কার করে দিল।

"তারপর বসে বসে অনেক আলোচনা করলাম দু'জনে। দু'জনের মনেই তখন বেশ দৃঢ় ধারণা জন্মেছে যে, মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটতে চলেছে আমাদের জীবনে।

"আমি বললাম—'ইরা, চল্, কিছু খাবার আর জল সঙ্গে নিয়ে আমরা ঐ নৌকোটায় করে সমুদ্রের বুকে ভেসে পড়ি—পালাই চল্।'

"ইরা একটু ম্লান হেসে বললে—'ছোড়দা, আত্মহত্যা করা হবে সেটা। আত্মহত্যাই যদি করতে চাও, এখানেই করতে পারবে নানা উপায়ে। আর এখান থেকে পালিয়েই কি নিষ্কৃতি পাবে ঐ ক্যাংগাস-রূপী শয়তানের হাত থেকে? ওর বীজ ত এর মধ্যেই আমাদের শরীরের মধ্যে সংক্রামিত হয়েছে।'

"হতাশভাবে বললাম—'তবে এখানেই থাকা যাক। দেখা যাক অদৃষ্টে কী আছে!'

"এক মাস গেল—দু'মাস গেল, তিন মাসও গেল। যেখানে বার হয়েছিল ক্যাংগাস সেখানে ত বার হলই—আরও দু-এক জায়গায় বার হল আমাদের শরীরে। তবুও বেশী বার হতে পারল না, তার কারণ আমরা প্রাণপণে লড়ে চলেছি যাতে সেগুলি আর বেশী বাড়তে না পারে।

"সাহসে ভর করে জাহাজে গিয়ে আমাদের দরকারী জিনিসপত্র নিয়ে আসতাম মাঝে মাঝে। সেখানে জাহাজের মাঝে দেখতাম ক্যাংগাসের তাণ্ডব লীলা চলেছে। আমরা প্রথমে যা দেখেছিলাম, তার শতগুণ বেড়ে গেছে সেগুলো।

"আমরা ঐ দ্বীপ ত্যাগের আশা চিরতরে নির্বাসন দিলাম মন থেকে। কারণ এটা বেশ বুঝতে পারলাম, সুস্থ মানবসমাজের মধ্যে আর আমাদের যাওয়া চলতে পারে না, কারণ তাহলে তাদের মধ্যেও এই ক্যাংগাসের বিষ সংক্রামিত হবে।

"তখন আমাদের শুধু এই চিন্তা হল যে, খাবার সম্বন্ধে খুব বুঝে-সুঝে চলতে হবে আমাদের। কারণ আমাদের এই ধারণাই হয়েছিল—বহু, বহুদিন বাঁচতে হবে আমাদের এই দুর্ভাগ্য নিয়ে, এই একই অবস্থায়—মনের স্থবিরতা নিয়ে।

"বলেই রণু বললে—'তোমাদের আমি প্রথমে বলেছিলাম যে আমি একজন বৃদ্ধ। সেটা আমার বয়সের হিসাবে নয় সেটা, সেটা—' বলতে বলতে হঠাৎ সে একেবারে ভেঙে পড়ল।

একটু পরে সামলে নিয়ে আবার বলতে লাগল রণু—'আমরা ভাবছিলাম বটে খাবার সম্বন্ধে বুঝে-সুঝে চলতে হবে আমাদের, কিন্তু আমরা তখন জানতাম না যে খাদ্য আমাদের নিঃশেষ হয়ে এসেছে। একদিন জাহাজে রুটি আনতে গিয়ে দেখি, যে বাক্সগুলিতে রুটি ভর্তি আছে ভেবেছিলাম সেগুলি

সব খালি। সামান্য কিছু মাংস আর কিছু ফল ছাড়া জাহাজে আর কিছুই নেই খাবার।

"তখন নিরুপায় হয়ে ঐ 'ল্যাগুনের' মধ্যেই মাছ ধরবার চেষ্টা করলাম কিন্তু একটা মাছও মিলল না অদৃষ্টে একদিনও। শেষকালে খোলা সমুদ্রের মাঝে এসে চেষ্টা করলাম। মিলল বটে কয়েক রকমের কিসব মাছ—তবে সেও বেশী নয়। তাতে লাভ হল না কিছু, ক্ষিধে আমাদের মিটল না তাতে। ভাবলাম, জাহাজের ঐ খাবার জিনিস কটা ফুরোনোর সঙ্গে সঙ্গেই আমাদেরও শেষ হবে।

"এমনি করে চতুর্থ মাসও কেটে গেল। হঠাৎ একদিন এক করুণ অথচ ভয়াবহ দৃশ্য আমার চোখ পড়ল। জাহাজ থেকে কি একটা জিনিস নিয়ে ফিরছি, দেখি যে ইরা তার তাঁবুর সামনে বসে কি একটা যেন খাচ্ছে।

"আমি জিজ্ঞাসা করলাম—'কি খাচ্ছিস রে ইরা?'

"আমার কথা শুনে মুখ তুলে তাকিয়ে আমাকে দেখে সে হঠাৎ কি রকম অপ্রস্তুত হয়ে গেল। তারপর যেটা খাচ্ছিল সেটা তাড়াতাড়ি ফেলে দিল ছুঁড়ে। আমার মনে কি রকম একটা সন্দেহ হলো। আমি গিয়ে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে এলাম। খানিকটা ধূসর ফ্যাংগাস সেটা।

"আমি সেটা হাতে করে এগুতেই ওর মুখ ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল। ভয়ে আমারও মুখ তখন পাংশু হয়ে গেছে।

"বললাম—'ইরা, ইরা, বোনটি—' আর কোনও কথা আমার মুখ দিয়ে বার হল না।

"আমার ঐটুকু কথাতেই ও একেবারে ভেঙে পড়ল, মাটিতে লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদতে লাগল। ইরাকে কোনদিন আমি জীবনে এরকম কাঁদতে দেখিনি। ওর ঐ কান্না দেখে আমার বুকটার মধ্যেও গুমরে গুমরে উঠতে লাগল; কী করব ভেবে ঠিক করতে পারলাম না।···

"অল্পক্ষণের মধ্যেই ও নিজেই প্রকৃতিস্থ হল। প্রকৃতিস্থ হলে ওর কাছ থেকে শুনলাম আগের দিন ওর মনে হঠাৎ দুর্দমনীয় ইচ্ছা জেগে ওঠে ঐ ফ্যাংগাসগুলো খেয়ে দেখবার জন্য। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও সে দমন করতে পারেনি নিজেকে। মাটি থেকে একমুঠো ছিঁড়ে নিয়ে মুখে দিতেই ওর অদ্ভুত রকমের ভাল লাগল ওর আস্বাদ। অথচ আশ্চর্য, ঐ দুর্দমনীয় ইচ্ছা মনে জাগবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ওগুলির প্রতি তীব্র ঘৃণাই জেগেছিল ওর মনের মধ্যে।

"আমি ইরার মাথাটা টেনে নিয়ে আদর করে বললাম—'বোনটি আমার! তোর এ অসংযত ব্যবহারের জন্য অত উতলা হওয়ার কিছু নেই। তবে প্রতিজ্ঞা কর্, আর কোনদিন ছুঁবি না ওগুলোকে?'

"ও প্রতিজ্ঞা করল—দৃঢ়ভাবেই প্রতিজ্ঞা করল যে ও আর কিছুতেই ওগুলি মুখের কাছে আনবে না কোনদিন।

"খানিক পরে কি রকম একটা অস্বস্তি বোধ হতে লাগল—বিশেষতঃ ইরার এই ফ্যাংগাস খাওয়ার ব্যাপারটাতে মনটা বড় বেশী চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। আমি ধীরে ধীরে উঠে বনের মাঝে চলতে লাগলাম সেই বালির মত পদার্থের আঁকা-বাঁকা পথ ধরে। দু' একদিন এ পথে এসেছে, কিন্তু বেশীদূর এগুতে সাহস হয়নি। আজ অন্যমনস্কভাবে ভাবতে ভাবতে চলে গেলাম বহুদূর—বনের মাঝে।

"চলছি আপন মনে নানা কথা ভাবতে ভাবতে, হঠাৎ একটা অদ্ভুত খসখসে শব্দ যেন কানে এল ঠিক আমার পাশ থেকে। ফিরে তাকিয়ে দেখি, আমার পাশে একটা ফাংগাসের স্তূপ নড়ছে,—একেবারে আমার হাতের কনুইএর কাছে। ভয়ে ভয়ে সেদিকে তাকাতেই হঠাৎ আমার মনে হল, ওটা ত ঠিক সাধারণ স্তূপের মত মনে হচ্ছে না! মনে হচ্ছে,—মনে হচ্ছে একটা বিকৃত মনুষ্যদেহের সঙ্গে ওর যেন অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে!

"হঠাৎ দেখি সেই স্তূপের মধ্যে থেকে ডালের মত কি একটা অংশ পৃথক হয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছে! সেই অংশটার মাথাটা গোলাকৃতি। আমি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম, হঠাৎ সেই বিকৃত মনুষ্যদেহের মত ফ্যাংগাস-স্তূপ তার সেই শাখা-সদৃশ বাহুটার গোলাকৃতি মাথাটা আমার মুখে বুলিয়ে দিল আস্তে। আমি চীৎকার করে কয়েক পা পিছিয়ে গেলাম। তারপর পালিয়ে এলাম ভয়ে সেখানে থেকে মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে।

"সেই স্তূপটা আমার ঠোঁটের যে জায়গায় ছুঁয়েছিল সেখানটা কি রকম যেন মিষ্টি মিষ্টি লাগতে লাগল। আমি একবার ঠোঁটটা চেটে দেখলাম। আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে কী দুর্দমনীয় বাসনা জেগে উঠল মনে ঐ ফাংগাস খাওয়ার জন্য। আমি মাটি থেকে একমুঠো ছিঁড়ে মুখে পুরে দিলাম—তারপর আরও আরও। উঃ, তৃপ্তি আর হয় না! অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে যখন পাগলের মত চিবোচ্ছি ঐ ফ্যাংগাসগুলো তখন হঠাৎ মনে হল, ইরাকে না প্রতিজ্ঞা করিয়েছি যে সে মরে গেলেও আর মুখের কাছে আনবে না ও জিনিস! আর আমি,

আমি নিজে— ? আমার হাতে যে ফ্যাংগাসটুকু ছিল তা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম মাটিতে। তারপর ধীরে ধীরে ফিরলাম তাঁবুর দিকে। ভয়ে, দুঃখে অনুশোচনায় তখন বুকের ভিতরটা মুচড়ে মুচড়ে উঠছে।

"আমার মুখের ভাব দেখেই ইরা ধরেছে যে সাংঘাতিক রকমের একটা কিছু ঘটেছে। ইরা ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করল—'কী হয়েছে ছোড়দা ?'

"উত্তরে আমি শুধু বললাম -'তোকে যে কাজ করতে এত করে মানা করলাম সেই অন্যায় কাজ নিজেই করেছি এক্ষুনি ; উঃ, কি দুর্দমনীয় ইচ্ছা—।'

"সবই বললাম—বললাম না শুধু কী দেখেছি বনের মধ্যে, কী সে করুণ অথচ ভয়াবহ দৃশ্য। ওর জীবনে আর দুঃখ টেনে আনি কেন ?

"ওকে বললাম না। আমার মস্তিকের মধ্যে কিন্তু দিনরাত ঐ ভীষণ চিন্তা ঘুরে বেড়াতে লাগল, পাগল করে তুলল আমাকে। কারণ আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলাম যে ঐ জাহাজে করে যারা একদিন এইখানে এসেছিল তাদেরই একজনের চরম পরিণতি সেদিন নিজের চোখে দেখে এসেছি। আর ওকে দেখে এও বেশ বুঝলাম, আমাদেরও চরম পরিণতি ঐ।

"ঐ ফ্যাংগাস আহারের দুর্দান্ত ইচ্ছা তখন আমাদের রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে। তবুও আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করে সে ইচ্ছাকে সংযত করে রাখলাম। কিন্তু, রাখলে কী হবে? যা খেয়েছি তার ফল শুরু হয়ে গেছে এর মধ্যে। দেখতে দেখতে ঐ ফ্যাংগাসগুলো, ঐ রাক্ষসগুলো—আমাদের দেহ নির্মমভাবে ছেয়ে ফেলতে শুরু করল। এবার আর পারলাম না তাদের বাধা দিতে। কাজে কাজেই, আমরা একদিন যারা মানুষ ছিলাম—সেই আমরা আজ হয়ে গেলাম—যাক—

'তবুও, তবুও আমরা ঐ ফ্যাংগাস খাইনি কিছুতেই। যদিও খাওয়ার দুর্দমনীয় ইচ্ছার সঙ্গে সংগ্রাম করা যে কী কষ্টকর— !

"জাহাজের খাবার সব ফুরিয়ে গেছে আজ ক'দিন হল। তারপর মাত্র তিনটি মাছ ধরেছিলাম ছোট ছোট।

"ইরা ক্ষুধাতে মৃতপ্রায়, আজ রাতে তাই আবার মাছ ধরতে বার হয়েছিলাম। দেখা পেলাম হঠাৎ তোমাদের জাহাজের। ডাকলাম তোমাদের···তারপর ত' সবই জান।"

রণু থামল একটু। তারপর বললে—"সেই দেখা পেলাম, যদি কয়েকমাস আগে দেখা পেতাম তোমাদের তা'হলে আমাদের অত আদরের

ইরাকে আজ···তবুও ত অজয়, আজ তোমারই দেওয়া খাবার ইরার মুখে তুলে দিতে পারলাম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আজ ত সে বাঁচল ক্ষিধের যন্ত্রণা থেকে!"

"দাঁড়ের শব্দ শুনলাম হঠাৎ একটা, তারপর আর একটা, তারপর আরও অনেকগুলো। রণু চলে গেল।

"দূর থেকে সে চীৎকার করে বলল –'অজয়, চললাম ভাই, বিদায়'।

"সে স্বর যেন কোনও অশরীরীর—যেন কান্নায় ভরা!

"আমার বুক ফেটে কান্না বার হয়ে এল। অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে চীৎকার করে উত্তর দিলাম—"বিদায়, বন্ধু!" কণ্ঠ আমার রুদ্ধ হয়ে এল!

"তাকিয়ে দেখি আকাশের দিকে—তখন ভোর হচ্ছে। সূর্যের অস্পষ্ট আলো সমুদ্রের বুকে পড়ে কুয়াসাটাকে পাতলা করে দিয়েছে। সেই অস্পষ্ট আলোয় চোখে পড়ল, দূরে একটা নৌকো যাচ্ছে। একটু পরে আর নৌকাটা দেখা গেল না। শুধু দাঁড়ের শব্দ শোনা যেতে লাগল। খানিক পরে সে শব্দটুকুও মিলিয়ে গেল অসীম সমুদ্রের বুকে।"

অজয় থামল। চোখ দুটিতে তখন তার অশ্রু টল টল করছে। সমস্ত ঘরটার আবহাওয়া তখন এক করুণ কান্নার সুরে ভরা।



গল্প



ম্যাও-ভূত

বাঁশবুনে গাঁয়ের জগাপিসী—ডাকসাইটে মেয়েলোক। ডিগ্‌ডিগে-রোগা মিশমিশে-কালো, খিট্‌খিটে মেজাজ। খন্‌খনে কাঁসরের মত তার গলার আওয়াজ। সে আওয়াজটি একবার জোরসে ছাড়লে পাড়ার সমস্ত লোক দুই কানে আঙুল দিয়ে উবু হয়ে মাটিতে বসে পড়ে, কুকুর বেড়াল সব ছুটে পালায়, গাছ থেকে পাখিরা সব ভয়ে পাখা মেলে উর্ধ্বশ্বাসে কোথায় যে উধাও হয়ে যায় তার ঠিক থাকে না, এমন কি পাড়ার ছেলেদের পূজোর সময়কার কান-ঝালাপালা-করা সমস্ত লাউড-স্পীকারের বিকট আওয়াজ পর্যন্ত একসঙ্গে ঢাকা পড়ে যায়। সারা গাঁয়ের লোক কাঁপে জগাপিসীর ভয়ে। সাধারণ মানুষ ত ছাড়, চোর-ডাকাত বাঘ-ভালুক তারাও ভয়ে পিসীর ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে সাহস করে না। একবার হয়েছে কি একটা চোর পিসীর ঘরে চুরি করতে ঢুকেছে। পিসী তাই জান্‌তে পেরে রান্নাঘরের উনুন থেকে একটা জ্বলন্ত লম্বা কাঠ নিয়ে এসে চুপি চুপি গিয়ে সেই কাঠটা চোরটার পেটের উপর চেপে ধরে তাকে এমন দেওয়াল-ঠেসা করে ধরল যে চোর বেটাত ধরা পড়েই গেল, উপরন্তু পেটের ঘা নিয়ে পাক্কা ছ'টি মাস রইল পড়ে হাসপাতালে। আর একবার পিসীর ঘরে লুকানো টাকার খবর পেয়ে ডাকাত পড়ল তার বাড়ীতে। ডাকাতেরা পিসীর দিকে এগিয়ে আসতেই পিসী তার হাতের কাছে, যে খালি বালতিটা ছিল সেই বালতিটা হাতে তুলে নিয়ে মুগুর ঘোরানোর মত এইসা জোরে বন্‌বন্‌ করে ঘোরাতে লাগল যে ডাকাত-গুলো ত পিসীর কাছে এগুতে পারল না, উপরন্তু ঐ বালতির চোটে একটা ডাকাতের মাথা ফেটে গিয়ে ঝরঝর্‌ করে রক্ত পড়তে লাগল—অজ্ঞান হয়ে সে ডাকাতটা মাটিতে পড়ল লুটিয়ে। তাকে ফেলে রেখেই বাকী

ডাকাতগুলো ধরা পড়ার ভয়ে উর্ধ্বশ্বাসে দিল দৌড়। ধরা অবশ্য তারা সবাই পড়ল শেষ পর্যন্ত। আর একবার আর এক কাণ্ড। রাত তখন দুপুর, একটা প্রকাণ্ড কেঁদো বাঘ কোথা থেকে এসে পিসীর উঠানে বসে লেজ আছড়াচ্ছে আর গর্জন করছে। পিসী তাই জানতে পেরে তার ঘরের জানালাটি ফাঁক করে লণ্ঠনটি নিজের মুখের কাছে তুলে ধরে দাঁত খিঁচিয়ে এমন একটা বিদিকিচ্ছিরি বিকট আওয়াজ ছাড়ল যে বাঘটা ভয়ে সোজা উপর দিকে প্রায় তিন হাত লাফিয়ে উঠে, পরে নেংটি ইঁদুরের মত চোঁচা দৌড়। এরপর গাঁয়ের ত্রিসীমানায় কেউ কখনও আর কোনও বাঘ দেখেনি।

এমন যে দুর্জয় পিসী যার ভয়ে ত্রিসংসার কম্পমান সেই পিসীর নিজের ছিল একটি বিষয়ে দারুণ ভয়—ভূতে। 'ভূত' কথাটা শুনলেই পিসী ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে থাকত। ঘরের সব দেওয়ালে ছিল 'রাম'-নাম লেখা, বালিশের তলায় থাকত 'রাম'-নাম লেখা কাগজ। সন্ধ্যার পর পিসী সহজে ঘরের বার হোতো না, 'রাম'-নাম লেখা নামাবলী গায় জড়িয়ে থাকত সন্ধ্যার পর থেকেই।

পিসী ছিল দারুণ কিপ্‌টে—'হাড়কিপ্‌টে' যাকে বলে। লোকে বলত ওর অনেক টাকা, কোথায় মাটির তলায়-টলায় লুকিয়ে রেখেছে। নিজে দিন সে চালায় সামান্য দুটো আতপ চালের ভাত খেয়ে, আর ছেঁড়া ছেঁড়া দু-একখানা কাপড় প'রে। শোয় একখানা ভাঙ্গা নড়বড়ে চৌকিতে। চৌকিতে পাতা থাকত একটা ছেঁড়া মাদুর আর একটা পুরানো বালিশ। শীতকালে পিসী গায় দিত একটা জরাজীর্ণ মান্ধাতার আমলের ছেঁড়া লেপ। ওর হাত দিয়ে, লোকে বলত, জলও নাকি গলে না। কোনও ভিখিরিকে পয়সা ত দূরের কথা, দুটো চালও কেউ দিতে দেখেনি পিসীকে কখনও।

এমন যে 'হাড়-কিপ্‌টে' পিসী তার ছিল কিন্তু একটা অদ্ভুত অস্বাভাবিক রকমের দুর্বলতা। কবে, কোথা থেকে একটা সিঁট্‌কে বিশ্রী বেড়ালের বাচ্চা এসে পিসীর ঘরে একদিন আশ্রয় নিল। পিসী প্রথমটায় অনেক তাড়াহুড়ো করল বেড়ালটাকে, বেড়ালটা কিন্তু কিছুতেই পিসীর ঘর ছাড়ল না। শেষ পর্যন্ত কে জানে, কী মনে করে পিসী তার ভাত থেকে দুটো দুটো ভাত বেড়ালটাকে দিতে লাগল। কিছুদিন যেতে পিসীর

কেমন যেন মায়া পড়ে গেল তার উপর। পিসীর আপন বলতে ত্রিসংসারে কেউ ছিল না, এই বেড়ালটাই হয়ে উঠল তার পরম আদরের ধন। আদর, যত্ন ক্রমশঃই বাড়তে লাগল, বাড়তে লাগল তার খাওয়ার বহর, শোয়ার আরাম, মাছ ভাত দুধ রোজ হলো বেড়ালের খাবার—মাঝে মাঝে মাংস, এমনকি এক এক দিন রাবড়ি পর্যন্ত, শোয়ার বন্দোবস্ত হল নরম বিছানায়। সকাল বেলা বেড়ালের জন্য রান্না-বান্না শেষ করে, তাকে খাইয়ে তারপর স্নান করে কাপড় ছেড়ে নিজের জন্য দুটো চাল ফুটিয়ে নিয়ে পিসী খেতে বসত। বেড়ালটা হয়ে উঠল পিসীর মাথার মণি, ধ্যান-জ্ঞান সব কিছু।

কিন্তু হঠাৎ হোলো কি—পিসী একদিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে দেখল, বেড়ালটা তার বিছানা থেকে নেমে গিয়ে মরে পড়ে আছে মাটিতে। কী করে মরল, কে জানে। পিসী ত প্রথমে তার নিজের চোখকে বিশ্বাসই করতে পারল না। শেষ পর্যন্ত, যখন সে বুঝল যে সত্যিই বেড়ালটা মরেছে তখন তার সে কী কান্না—মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদলে ত আর চলবে না, মরা বেড়ালটার একটা গতি করতে হবে ত! কিন্তু, মরা বেড়াল 'আচারে' পিসী ছোঁয় কী করে, জ্যান্ত বেড়াল তার যত আদরেরই হোক, মরা বেড়াল ত ছুঁতে পারে না সে। মরা বেড়াল ছুঁলে যে জাত যাবে তার। ও ত মরা ফেলে যারা তাদেরই কাজ। কী করে পিসী। শেষ পর্যন্ত পাড়ার ছেলেদের কাছে গিয়েই বিনীতভাবে অনুরোধ জানাল বেড়ালটার গতি করবার জন্য। ছেলেরা এতদিনে এবার পিসীকে তাদের হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েছে। উঃ, ওরা ভোলেনি সেদিনকার অপমানের কথা। পাড়ায় দুর্গাপূজা হবে—বেপরোয়া কয়েকটা ছেলে গিয়েছিল পিসীর বাড়ী সামান্য কিছু চাঁদা চাইতে। পিসী তাদের দেখে বললে—'চাঁদা নিতে এসেছিস্? আচ্ছা, দাঁড়া দিচ্ছি—' বলে ঘরের ভিতর চলে গেল। ছেলেরা খুব উৎসাহিত হয়ে অপেক্ষা করছে, এমন সময় পিসী করলে কি—এক হাতা উনুনের ছাই নিয়ে এসে তাদের সামনে ঢেলে দিয়ে বললে—'এই নে চাঁদা—'। আজ ওরা সেই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছে। দেখা যাক মরা বেড়াল কে ফেলে। পিসীকেই আজ নিজে হাতে করে সকলের সামনে মরা বেড়াল ফেলতে হবে তার সব জাত ধর্ম খুইয়ে

কিছুতেই রাজি হোলো না ছেলেগুলো, পিসী কত কাকুতি মিনতি করল তবুও না। পিসী যখন প্রায় দিশেহারা হয়ে গেছে কী করবে ভেবে ঠিক করতে পারছে না তখন হঠাৎ কোথা থেকে ঐ ছেলেদের দলের সর্দার আদিত্য এসে হোলো উপস্থিত। সব শুনে, কী ভেবে একটু সে রাজি হয়ে গেল মরা বেড়ালের সংকার করতে। ছেলেরা মহা বিরক্ত হয়ে উঠল আদিত্যের এই ব্যবহারে। আদিত্য তাদের একপাশে নিয়ে গিয়ে কী সব বলতেই তাদের মুখের চেহারা বদলে গেল। ওরা পিসীর বাড়ীর দিকে চললো দল বেঁধে আদিত্যের সঙ্গে। পিসীও নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো।

বাঁশ বাকারী দিয়ে একটা ছোটো চৌদালা তৈরী করে তার উপর মরা বেড়ালটাকে শুইয়ে আদিত্য ও আর ক'জন ছেলে মিলে সেইটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে চললো রাস্তা দিয়ে গাঁয়ের একপাশে একটা বনের দিকে। বাকী ছেলেরা চললো ওদের পিছু পিছু। পিসীও চললো সকলের পিছনে চোখের জল মুছতে মুছতে।

বনের ধারে গিয়ে ওরা কতকগুলি গাছের শুকনো ডালপালা জড় করে তাতে আগুন লাগালো। তারপর মরা বেড়ালটাকে দিল তার উপর শুইয়ে। পিসী খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখে চোখ মুছতে মুছতে বাড়ী ফিরে গেল। পিসী চলে যেতেই ওরা আধ-পোড়া বেড়ালটার ল্যাজ ধরে বনের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সবাই বাড়ী চলে গেল হাসতে হাসতে।

এরপর প্রায় দশটা দিন কেটে গেল। আদিত্য এসে হাজির হোলো পিসীর বাড়ীতে। পিসীকে বললে সে—"পিসী, দশদিন ত প্রায় হয়ে গেল, এবার একটা শ্রাদ্ধের বন্দোবস্ত হওয়ার দরকার।"

পিসী প্রথমটায় কিছু বুঝতে পারলে না, জিজ্ঞাসা করলে—"শ্রাদ্ধ? শ্রাদ্ধ কার?"

উত্তর দিলে আদিত্য—"শ্রাদ্ধ আপনার বেড়ালের।"

পিসী আরও অবাক হয়ে বললে—"বেড়ালের শ্রাদ্ধ কেউ করে নাকি কখনও? কত বেড়ালই ত মারা যায়—"

আদিত্য বলে, "—আহা, সব বেড়াল আর এ বেড়াল কি এক হলো? এ বেড়াল ত শুধু বেড়াল ছিল না, ও ছিল আপনার সন্তানতুল্য—না, সন্তানেরও বাড়া! তাছাড়া ওকে আমরা, ব্রাহ্মণ-সন্তানেরা কাঁধে করে নিয়ে

গিয়ে দাহ করে এসেছি। শ্রাদ্ধ না করলে ওর আত্মার সদ্‌গতি হবে না যে, আপনি কি তাই চান?"

পিসী খানিকক্ষণ কী ভাবলো। তারপর আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলো—"তা কি করতে হবে?"

আদিত্য উত্তর দিলে—"বিশেষ এমন আর কি? সামান্য একটু শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা আর কয়েকজন লোক খাওয়ানো—"

পিসী চমকে উঠে আদিত্যের কথায় বাধা দিয়েই বললে—"খাওয়ানো? কোন্ লোকেদের খাওয়ানো?"

আদিত্য যেন একটু আশ্চর্য হয়েই বল্লে—"বারে! শ্রাদ্ধ হবে, অথচ খাওয়াতে হবে না—শ্মশান-বন্ধুদের সব? যারা আপনার বেড়ালকে কাঁধে করে নিয়ে গিয়ে দাহ করে এল তাদের না খাওয়ালে শ্রাদ্ধ কী হোলো?"

পিসী গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"কী খাওয়ানো হবে?"

আদিত্য বললে—"এই লুচি, তরকারী, মাছ, মাংস—"

পিসী এবার বিরক্ত হয়ে বললো—"কী পাগলের মত বকছিস্? শ্রাদ্ধে আবার মাছ মাংস খাওয়ায় কে?"

আদিত্য একটু মৃদু হেসে বললো—"খাওয়ায়, খাওয়ায়। অনেকেই খাওয়ায়। আপনার অত আদরের বেড়াল যা যা রোজ সে খেত, যা যা খেতে সে ভালবাসত—মানে, মাছ, মাংস, দই, রাবড়ি, সন্দেশ, সব কিছু খাওয়াতে হবে!"

পিসী গম্ভীর চাপা গলায়, জিজ্ঞাসা করলে—"সব নিয়ে কত খরচ পড়বে?" পিসীর সহ্যের সীমা বুঝি ছাড়িয়ে যায় এবার।

আদিত্য যেন কিছুই না এমনি ভাবেই বললে—"কত আর? এই—সব নিয়ে শো দেড়েক দুয়েক—"

আর বলতে হোলো না। পিসী চোখ লাল করে তার সেই বাজখাঁই গলায় বিকট চীৎকার করে উঠল—"বেরো, বেরো, বেরো আমার বাড়ী থেকে। বেড়ালের শ্রাদ্ধ করতে হবে তার জন্য আবার দুশো টাকা খরচ? আমার গলায় ছুরি দিতে চাস্, বেটারা? বেরো, বেরো—"

পিসীর ঐ রুদ্রমূর্তি দেখে আদিত্য ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালিয়ে গেল। যাওয়ার সময় চেঁচিয়ে বলে গেল—"বেড়ালের আত্মার কিন্তু সদ্‌গতি হবে না।"

পিসী তার চেয়েও অনেক বেশী চেঁচিয়ে বলল—"না হোক গে—"

এরপর মাত্র ক'টা দিন গেছে। সেদিন সকাল বেলা পিসী এসে উপস্থিত আদিত্যের বাড়ী। পিসীকে এর আগে কারোর বাড়ীর দরজা মাড়াতে দেখেনি কেউ। এ পিসী আর সে পিসী নয়। গলার স্বর কোথায় নেমে এসেছে। সমস্ত মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে মেরে গেছে।

আদিত্য যেন একটু আশ্চর্য হয়েই বললে—"আরে, পিসী যে, কী ব্যাপার?"

পিসী ভয়ে ভয়ে বললে—"কাল সারারাত আমার ঘরের বাইরে চার পাশে সমানে 'ম্যাও-ম্যাও' ডাক শুনেছি, বাবা।"

আদিত্য বললে—"তাই নাকি! তা ও ত আসবেই জানতাম—"

পিসী জিজ্ঞাসা করল—"কে আসবে জানতে?"

আদিত্য বলল—"কে আবার? ম্যাও-ভূত, আপনার বেড়ালের প্রেতাত্মা।"

পিসী শুনে ভয়ে একেবারে আঁতকে উঠলো। শুধু বললে আস্তে আস্তে "বেড়ালও মরে কি ঐ হয়?"

আদিত্য বললে—"হয় বৈ কি। মানুষ মরলে হয় মানুষ-ভূত, গোরু মরলে গো-ভূত, কুকুর মরলে ঘেউ-ভূত, বেড়াল মরলে ম্যাও-ভূত—। ভূত-পুরাণে সমস্ত লেখা আছে পড়ে দেখবেন।"

পিসী অতি কাতরভাবে বললে—"তা হলে কী হবে?"

আদিত্য বললে—"শ্রাদ্ধ করুন বেড়ালের। তখনই ত বলেছিলাম ওর আত্মার সদগতি হবে না শ্রাদ্ধ না করলে—সমানে ঘুরবে আপনার চারপাশে—"

পিসী বললে—"তা বাবা, শ্রাদ্ধের বন্দোবস্তই না হয় কর তোরা। তবে বাবা, একটু কমসম করে খরচ করবার চেষ্টা করিস্—" পিসীমার চোখে জল।

ক'দিন পরেই দেখা গেল আদিত্য আর তার বন্ধুর দল লুচি মাছ মাংস দই সন্দেশ রাবড়ি সব পেট ভরে খেয়ে পান চিবুতে চিবুতে পিসীর বাড়ী থেকে বার হচ্ছে, আর তাদের সামনে চলেছে রিক্স বোঝাই সব শ্রাদ্ধের দান-সামগ্রী নিয়ে পুরোহিত-বেশী আদিত্যের এক ওস্তাদ বন্ধু।

পিসী শোকে মূহ্যমান। বেড়ালের শোক কমলেও টাকার শোক পিসীকে যেন সব সময় আছড়ে মারছে।

বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। কী কাণ্ড। হঠাৎ আবার নতুন করে

সুরু হলো এক উৎপাত—রাত্রি বেলা আবার পিসীর ঘরের আশে-পাশে শুধু নয়। একেবারে ঘরের মাথায় পর্যন্ত সেই "ম্যাও-ম্যাও" ডাক সমানে।

পিসী ছুটলো আবার আদিত্যর কাছে। পিসী থর থর করে কাঁপছে ভয়ে—চোখদুটো যেন বার হয়ে আসছে কোটর থেকে। গলার স্বর তার একেবারে বন্ধ হয়ে এসেছে। কোনও রকমে সে ঘটনাটা জানালে আদিত্যকে অতিকষ্টে।

আদিত্য সব শুনে বললে—"বড্ড ভালবাসত বেড়ালটা আপনাকে। শ্রাদ্ধ করে শুধু হোলো না দেখছি—আপনাকে ছেড়ে ওর প্রেতাত্মা যেতে পারছে না। গয়ায় ওর পিণ্ডদান করে আসতে হবে—তবেই ছাড়বে আপনাকে, মানে ওর একেবারে মুক্তি হয়ে যাবে কিনা তাহলে—"

পিসী কাঁদতে কাঁদতে বললে—"গয়া? সেত অনেক দূর। আমি বুড়ো মানুষ যাব কী করে অতদূর?"

আদিত্য বললে—"আপনি যাবেন কেন? আমি—আমি ত আপনার সন্তানতুল্য। আমি আপনার হয়ে গয়ায় গিয়ে আমার বেড়াল ভাইএর প্রেতাত্মাকে পিণ্ডদান করে আসতে পারি—"

শেষ পর্যন্ত তাই ঠিক হোলো। গয়া যাতায়াতের ভাড়া ও পিণ্ডদানের খরচ বাবদ পিসীর কাছ থেকে আবার নগদ পঞ্চাশটি টাকা নিয়ে আদিত্য গয়া যাওয়ার তোড়জোড় করতে লাগলো।

আবার পঞ্চাশ টাকা গেল। শেষ নিঃশ্বাস পড়ে বুঝি এই টাকার নতুন শোকে। তবু এই আশা যে এবার বোধ হয় ম্যাও-ভূত তাকে ছেড়ে চলে যাবে চিরকালের মত।

এরপর আদিত্যকে পিসী দেখতে পেল না কয়েক দিন। ছেলেরা বললে সে গয়ায় গেছে।

ক'দিন পরে আদিত্য এসে হাজির হোলো পিসীর বাড়ীতে।

পিসী জিজ্ঞাসা করলো—"গয়ায় গিয়েছিলি—পিণ্ডদান করে এলি বাবা?"

আদিত্য ঘাড় নেড়ে বললো—হ্যাঁ, পিসীমা।

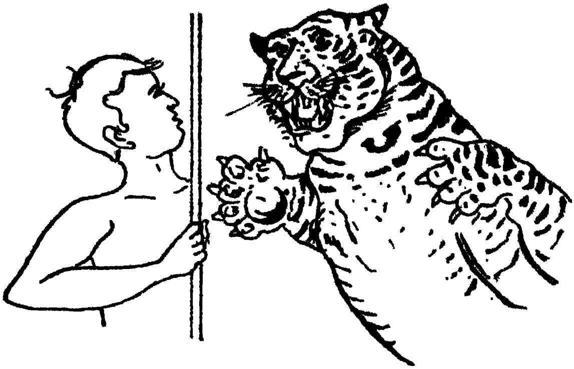
পিসী আবার জিজ্ঞাসা করলো—"ঠিকমত পিণ্ড গ্রহণ করেছে ত সে?"

আদিত্য জোরের সঙ্গে বললে—"করেনি? পরিষ্কার দেখলাম ছোট ছোট দুটো থাবা পেতে সে পিণ্ডগুলো নিয়ে নিল—"

পিসী এবার হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো। বিপদ কেটে যাওয়ায় টাকার শোকটা বোধ হয় আবার নতুন করে ওর বুকের মাঝে জেগে উঠলো ভীষণ ভাবে।

এর পরে শোনা গেল যে ঐ গ্রামে ঐ সময়ে যে নতুন একটা সিনেমা এসেছিল সেই সিনেমায় আদিত্য আর তার বন্ধুদের মাঝে মাঝেই নাকি যেতে দেখা গিয়েছিল, আর দেখা গিয়েছিল সিনেমার পাশের চায়ের দোকানটায় তাদের হরদম চা, টোস্ট, চপ কাটলেট এবং আরও অনেক কিছু গলাধঃকরণ করতে—

সে যাক্‌গে—শোনা কথায় কান দিতে নেই।



বাঘের সঙ্গে মুখোমুখি

রমেন সিংহকে তোমরা হয়ত চেন না—অনেকেই চেনে না, কিন্তু আবার চেনেও অনেকে। পূর্ববঙ্গের জমিদার ছিলেন—আপাততঃ কলকাতায় বাস তাঁর। জমিদারি ছেড়ে চলে এলে কি হবে—জমিদারি মেজাজ যাবে কোথায়! দশজনকে নিয়ে বাড়ীতে আসর জমাবার রাজা। অনেকে জমায়েত হয় সন্ধ্যাবেলায় তাঁর বাড়ীতে; আসর জমে—তবে বৈঠকী আসর নয়—ঘরোয়া আসর যাকে বলে। চা চলে সমানে—সিগারেটও। কিসের গল্পই না হয় সে আসরে! সাহিত্য, সংগীত, ধর্ম, রাজনীতি এসব আলোচনা যে হয় না সে-আসরে একথা বলিনে—তবে সে সব কথা ঠিক রসাল হয় না। বেশীর ভাগ জমে তখনই যখন হয় ভূতের গল্প, সাপের গল্প, বাঘের গল্প কিংবা ঐ জাতীয় আরও কিছু। সেদিনকার আসরে হঠাৎ কথা উঠল—বাঘের সঙ্গে মুখোমুখি কে হয়েছে? রমেন সিংহ যে হয়েছেন এ কথা কে না জানে। সিংহ মহাশয় নামে সিংহ হলেও মানুষটি ছোটখাট, ছিপছিপে চেহারা, মুখে মিষ্টি হাসি, হাতে সিগারেট দেখে মনে হয় কোনও কবি কিংবা কোনও কলেজের অধ্যাপক—ঐ নিরীহ মানুষটির হাতে গুলি খেয়ে যে বেশ কয়েকটি বাঘ ইহলীলা সংবরণ করেছে এ কথা মনে করা শক্ত। যাই হোক, ভদ্রলোক নিজের বাহাদুরি কখনও নিজ মুখে করেন না—জমিদারী গুণের তাঁর এ একটি মস্ত অভাব। ওঁর মুখ থেকে কিছুই শোনা গেল না।

যাঁরা ছিলেন উপস্থিত তাঁদের মধ্যে দু-একজন চেষ্টা করলেন আসর জমাতে। একজন বললেন—ঠিক মুখোমুখি হয়নি বটে তবে প্রায়

হয়েছিলাম। এক অন্ধকার রাতে একটা প্রকাণ্ড বনের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম; হঠাৎ 'ফেউ' ডাকতে লাগল—ওরে বাবা! ভয়ে তো আমার আত্মারাম খাঁচা ছাড়া। হঠাৎ একটা ভারী জানোয়ার লাফাতে লাফাতে চলে গেল আমি যে দিকে যাচ্ছিলাম তার উল্টো দিকে। ধড়ে প্রাণ ফিরে এল তখন!

জমল না মোটে। আর একজন বললে—প্রকাণ্ড বাঘ একটা এসেছিল একবার আমাদের বাগানে গরুর গোয়ালের কাছে। দরজা খুলতেই একেবারে মুখোমুখি। তাড়াতাড়ি দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিতেই এক লাফে চলে গেল সেটা পাঁচিল টপ্‌কে। অবশ্য আমি দেখিনি—আমার বড়মামা দেখেছিলেন, তাঁর মুখেই শুনেছি।

এ-ও জমল না। জোলো হয়ে এল আসরটা।

না, জোলো হবার জো কি। লক্ষ্মণ চৌধুরী, রমেন সিংহর মামাতো ভাই, খাস কলকাতার ছেলে, সে এতক্ষণ চা খাচ্ছিল। চা-এর কাপটি রেখে সে মনে হল এবার সুরু করবে। যে বিষয়ে কথা হোক, লক্ষ্মণ সকলকে মেরে বার হয়ে যাবে। রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, মতিলাল নেহেরু, লালা রাজপৎ রায়, সে জন্মাবার আগে যাঁরা মারা গেছেন সকলের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা, আলাপ আলোচনা হয়ে গেছে, যে সব জায়গায় যাওয়া যায় না সে সব জায়গায় সে-ই একা গেছে। বাঘ, ভালুক, হাতী, গণ্ডার এদের সঙ্গে ওর যথেষ্ট 'মোলাকাৎ' হয়েছে। যাক লক্ষ্মণ সুরু করলে—শিকার করতে গিয়ে বাঘের সঙ্গে মুখোমুখি অনেকবার হয়েছি। কিন্তু, নেমন্তন্ন খেয়ে ভরা পেটে সাইকেলে করে বাড়ী ফিরতে গিয়ে একবার বাঘের সঙ্গে মুখোমুখি হয়েছিলাম—সে কথা ভাবলেও আজ বুকের মধ্যেটা কিরকম ঢিপ ঢিপ করে।

একটা সিগারেট ধরাল সে, তারপর সিগারেটে একটা টান দিয়ে বললে—গেছি আমার মামার বাড়ী নসীপুরে বেড়াতে। সেখান থেকে প্রায় চার মাইল দূরে মামার এক বন্ধু করলেন একদিন নেমন্তন্ন। ট্রাম বাস তো নেই সেখানে, আছে ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ী—সে গাড়ী চড়তে লজ্জা করে। একখানা সাইকেল আর একটা টর্চ যোগাড় করে গেলাম নেমন্তন্ন খেতে। নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল। ভাবলাম পাকা রাস্তা দিয়ে না গিয়ে ধানখেতের পাশ দিয়ে যদি চলে যাই তাহলে

অনেক তাড়াতাড়ি হবে। চলেছি, অন্ধকার রাত, কেউ কথাও নেই। হঠাৎ মনে হলো পাশেই ধানখেতের মধ্যে কী একটা নড়ে উঠল। টর্চটা ঘুরিয়ে সেদিকে ফেলতেই দেখি প্রকাণ্ড এক বাঘ একেবারে মুখোমুখি। টর্চের আলোটা মুখে পড়তেই প্রথমটা সে একটু ঘাবড়ে গেল; তার পরের মুহূর্তেই বিরাট এক হুঙ্কার! আমি আর তিলমাত্র বিলম্ব না করে সেই ধানখেতের আলের উপর দিয়ে পন পন করে সাইকেল চালিয়ে দিলাম।

রমেন সিংহের ছোট ভাই অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—আলের ওপর দিয়ে?

লক্ষ্মণ বললে—হ্যাঁ, আলের উপর দিয়ে! পিছনে সামনে শব্দ শুনেছি—ভারী পায়ে লাফিয়ে আসছে বাঘটা—তাড়া করেছে। শব্দটা কাছে আসছে ক্রমশঃ। দুর্দান্ত স্পীড দিলাম সাইকেলে—বন বন বন। আমার সাইকেলের স্পীড তখন পাঞ্জাব মেলকেও হার মানায়। বেশ কিছুদূর আসবার পর একটা লোকালয়ের মধ্যে এসে পড়লাম; পিছনে শব্দটাও ততক্ষণে থেমে গেছে। যাক, বেঁচে গেলাম সে যাত্রা।

লক্ষ্মণ গল্প শেষ করে আবার এক কাপ চায়ের জন্য অনুরোধ জানাল। এ গল্পের পর আর এক কাপ চা সে নিশ্চয় পেতে পারে।

এ গল্পের পর আর কে গল্প বলবে? হঠাৎ সকলের চোখ পড়ল রমেনের এক দাদু—আদিত্য দাদুর উপর। তিনি এতক্ষণ ঘরের একটা কোণে বসে লক্ষ্মণের গল্প শুনছিলেন আর মুচকে মুচকে হাসছিলেন। রমেন বললে—দাদু, এককালে ত বন্দুক-টন্দুক নিয়ে বনে-জঙ্গলে অনেক ঘোরাফেরা করেছেন—নিশ্চয়ই কখন না কখনও দু-একটা বাঘের সঙ্গে মুখোমুখি হয়েছেন। বলুন না দাদু এক-আধটা গল্প।

আদিত্য দাদু বললেন—আরে—বন্দুক হাতে ঘুরেছি যখন তখন বাঘ ভালুক কোথায়—দু-একটা পাখি-টাখি মেরেছি হয়তো। বন্দুক ছেড়ে দিয়েছি কবে। তবে বন্দুক ছেড়ে দেওয়ার অনেক পরে এই কিছুদিন আগে একবার এক বাঘের সঙ্গে মুখোমুখি হয়েছিলাম। তবে লক্ষ্মণ ভায়ার মত পালাই নি। আচ্ছা, বলি সে গল্প শোন—

চেয়ারটা একটু এগিয়ে নিয়ে এসে বললেন—বন্দুক ছেড়ে দিয়ে তখন ধরেছি লাঠি—পাকা ইয়া মোটা—মাথা বেঁকান বাঁশের লাঠি। কলকাতার রাস্তা চলা বন-জঙ্গলে চলার চেয়েও ঢের বিপজ্জনক—রাস্তার খেঁকী কুকুর

আর ষাঁড়ের জন্য। ঐ লাঠিটি আমাকে কতবার যে রক্ষা করেছে তার ঠিক নেই। একবার ছ-ছটা কুকুরে আমাকে একসঙ্গে তাড়া করে এসে প্রায় শেষ করে দিয়েছিল আর কি! ঐ লাঠিটা ঘুরিয়ে ছ'টা কুকুরকে প্রায় ছত্রিশ টুকরো করে দিয়েছিলাম। আর একবার একটা ষাঁড় তেড়ে আসতে ঐ লাঠির ঘায়ে তার শিংশুদ্ধ মাথাটাকে একেবারে উল্টোদিকে বেঁকিয়ে দিয়েছিলাম। সেই লাঠি সব সময়েই হাতে থাকত। কি রাস্তায়, কি মাঠে, কি বনে জঙ্গলে। সেই লাঠিটি হাতে একবার এক দারুণ জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হলাম যাকে বলে শ্বাপদসঙ্কুল। বাঘ সিংহ ভালুক তো আছেই—হাতী গণ্ডার প্রভৃতিরও অভাব নেই। সন্ধ্যা হতে তখনও দেরী, কিন্তু দারুণ মেঘ করে সব আঁধারে ঢেকে গেছে। লাঠিটি বাগিয়ে ধরে অতি সাবধানে চলেছি। হঠাৎ শুনি পাশে, একেবারে আমার পাশেই এক বিরাট গর্জন। তাকিয়ে দেখি প্রায় বিশ-ত্রিশ হাত দূরে প্রকাণ্ড এক রয়াল বেঙ্গল টাইগার শুয়ে। বোধহয় আহার-টাহার সেরে বিশ্রাম করছিল—আমাকে দেখেই সোজা উঠে দাঁড়াল। বাঘের চেহারা দেখে ভয় পাবার ছেলে নই। ছোটবেলায় কত বাঘের চোখে মুখে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছি। পেটের ভেতর থেকে সব কিছু টেনে বার করেছি। অবশ্য জ্যান্ত বাঘ নয়, ছোবড়া তুলোয় ভরা মরা বাঘের কথা বলছি। যাক্, বাঘটা উঠে দাঁড়াতেই আমি ভাবলাম, পালাব না, লাঠিটা বাগিয়ে তুলে ধরলাম। বাঘটা তার গোঁফের একটা দিক উঁচু একটা দিক নীচু করে মুখের একটা দিকের দাঁতগুলো বার করে শক্ত হয়ে বিশ্রী একটা শব্দ করে দাঁড়িয়ে রইল আমার দিকে সোজা তাকিয়ে। আমিও তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। বাঘটা এবার একটা বিকট হুঙ্কার দিল—'উহুম'। সে হুঙ্কারে আমার ভেতরটা কেঁপে উঠল এ-কথা অস্বীকার করতে পারবো না। তবে প্রস্তুত হয়ে রইলাম। বাঘটা এবার আস্তে আস্তে একটু এগিয়ে এল। তারপরেই হুঙ্কার দিয়ে এক লাফ সামনে। আমি বিদ্যুৎবেগে সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে এলাম। এসেই আমার সেই লাঠিটা চক্রাকারে বন বন করে আমার চারপাশে ঘোরাতে লাগলাম। আমাকে আর দেখা যায় না। শুধু লাঠি আর লাঠি। বাঘটা কি রকম ভয়ে ঘাবড়ে গেল। চুপ করে রইল খানিকক্ষণ, তারপর পিছন ফিরে খানিকটা উল্টো দিকে চলে গেল। ভাবলাম, যাক আর আসবে না বোধ হয়। লাঠিটা একটু

থামালাম। ঘামে সমস্ত শরীর ভিজে গেছে তখন। ও বাবা, বাঘটা আবার ফিরে দাঁড়িয়ে বিরাট গর্জন সহকারে আবার আর এক লাফ! এবার আরো কাছে, মাত্র পাঁচ হাতের ব্যবধান। আমি আবার লাঠি চালালাম আগের চেয়েও জোরে। বাঘটা এবার সত্যিই কি মনে করে দূরে চলে গেল। আমি তখন আস্তে আস্তে চলে এলাম সেখান থেকে চারিদিকে সতর্ক নজর রেখে।

অজয়—রমেন সিংহের এক বন্ধু বললে—দাদু, একটা ঝুটা গল্প ছাড়লেন তো? লাঠি দিয়ে বাঘকে দিলেন হটিয়ে!

দাদু গম্ভীর হয়ে বললেন—ঐ জন্যই তো তোমাদের গল্প বলিনে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঠাকুরদাদা একটা সামান্য শিক দিয়ে একটা দুর্দান্ত ইয়া কেঁদো ভালুক মেরে ফেলেছিলেন—এ গল্প বই-এ পড়ে তো বেশ বিশ্বাস করতে পার! আর আমার ঐ দারুণ লাঠি দিয়ে, তাও বাঘ মারা নয়—বাঘকে ভড়কে দিয়েছিলাম সেটুকুও বিশ্বাস করতে পার না? হতাম আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত কারুর ঠাকুরদাদা তাহলে বিশ্বাস করতে, না।

আর এক বন্ধু বললে—দাদু, তাহলে বলতে চান যা বললেন তা সব সত্যি?

দাদু এবার চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে দেয়ালে একটা মা কালীর ছবি টাঙানো ছিল, সেইটা ছুঁয়ে বললেন এই মা কালীর ছবি ছুঁয়ে বলছি, যা বলেছি তার একটি বর্ণও মিথ্যা নয়—

সকলে এবার সত্যিই একটু অবাক হয়ে গেল। দাদু মা কালীর ছবি ছুঁয়ে শপথ করছেন—এ যে তাজ্জব ব্যাপার!

দাদু এবার একটু হেসে বললেন—তবে গল্পটা এখনও শেষ হয়নি। বাঘটা আমাকে কিছু বলবে কি করে? যতই কাছে আসুক না—তার আর আমার মাঝখানে যে লোহার গরাদ ছিল—মানে বাঘটা ছিল প্রকাণ্ড এক খাঁচার ভেতরে, আর আমি ছিলাম খাঁচার বাইরে; মানে জায়গাটা ছিল যে চিড়িয়াখানা।

সকলে হো হো করে হেসে উঠল এবার।

দাদু বললেন—কি হে লক্ষ্মণ ভায়া, তোমার বাঘের সঙ্গে মুখোমুখির চেয়ে আমার এটা কিছু কম কি?

পিছনে তাকিয়ে দেখেন লক্ষ্মণ এর মাঝে কখন হাওয়া হয়ে গেছে।



দুর্যোগের রাতে

সেদিন সকাল থেকেই সমস্ত আকাশটা কালো মেঘে ঢাকা—মনে হচ্ছিল, সারা আকাশটায় কে যেন কালি ছড়িয়ে দিয়েছে। বৈকালে অফিস থেকে যখন বাড়ী ফিরলাম তখন আকাশের অবস্থা আরও জটিল হয়ে উঠেছে। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে—মেঘের গুরু গুরু আওয়াজ আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছে।

কী করি? যাব, না যাব না? না, যেতেই হবে।

ক'দিন আগে অফিস থেকে ফিরে দেখি চিঠির বাক্সে একখানা নিমন্ত্রণের কার্ড—নাচ গান আবৃত্তির জলসায় নিমন্ত্রণ। চিঠির লেখাটা কী রকম একটু অদ্ভুত রকমের—পড়লাম অতি কষ্টে। চিঠির নীচে নাম স্বাক্ষর—প্রণবেশ চক্রধারী। কে এই প্রাণবেশ চক্রধারী? মনে আমার পরিচিত যতগুলি লোক আছে সকলের মাঝে মনে মনে ঘুরে এলাম। উঁহু—তাদের মধ্যে কোনও প্রণবেশ চক্রধারীর দেখা মিল্‌ল না। ভাবছি, ভাবছি আর ভাবছি। হঠাৎ মনে পড়ল! যখন কলেজে পড়তাম তখন কলেজের একটি ছেলে আমার কাছে আবৃত্তি শিখত। বেশ ভাল আবৃত্তি করত। কী খাতিরই

আমাকে না করত গুরু বলে। সে ত আজ কত বৎসর আগের কথা। এতদিন কোথায় ছিল সে—এতদিন পরে হঠাৎ আমাকে মনেই বা পড়ল কেন?—যাই হোক, একেই আমি এসব ব্যাপারে একটু বেশী মেতে উঠি, তার উপর আমার প্রিয় শিষ্যের নিমন্ত্রণ! যেতেই হবে তাই সন্ধ্যায় ওয়াটার প্রুফটা কাঁধে ফেলে বেরিয়ে পড়লাম।

ট্রামে চলতে চলতেই বৃষ্টি নামল—শুধু নামল নয়—নামল একেবারে অঝোর ধারে। সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের প্রলয় নাচন সুরু হোলো বৃষ্টির সঙ্গে তাল মিলিয়ে।

ট্রাম ত খানিকটা গিয়ে জলে ভিজে স্রেফ খোঁড়া হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। কী করি? টালিগঞ্জের এক প্রান্তে কোন এক সিনেমা-হল। দেশলাইটা পকেট থেকে বার করে জেলে ঠিকানাটা দেখে নিলাম। তারপর নামলাম ট্রাম থেকে। জানি এই দুর্যোগে কখনও জলসা হতে পারে না—তবুও প্রণবেশ আর তার দলের সকলের সঙ্গে দেখা হবে ত। আর তাছাড়া এই দুর্যোগে একটা আশ্রয়ও ত চাই।

খুঁজে খুঁজে অতি কষ্টে পৌঁছুলাম সেই সিনেমা হলে—সর্বাঙ্গ দিয়ে তখন জল ঝরছে।

যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। সমস্ত হলটায় আলোও জলছে, পাখাও ঘুরছে কিন্তু আমি ছাড়া আর দ্বিতীয় প্রাণী উপস্থিত নাই। স্বাভাবিক—আমার মত কারুর ত আর মাথা খারাপ হয়নি যে এই দুর্যোগে নাচ গান আবৃত্তি দেখতে বা শুনতে আসবে।

বসলাম একটা সামনের চেয়ারে। ভাবলাম—নিশ্চয়ই ওরা স্টেজের ভিতরে আছে—কেউ না কেউ একবার বাইরে আসবে এখনি।

অন্যমনস্ক হয়ে কী একটা ভাবছি—হঠাৎ দেখি স্টেজের সামনের পর্দাটা আস্তে আস্তে উঠে গেল। এ কি রে বাবা! এরা কি পাগল হয়ে গেল। কোনও লোকজন নেই অথচ এরা 'শো' আরম্ভ কর্তে যাচ্ছে। বোধ হয় এই দুর্যোগে কেউ না আসাতে ওরা মরীয়া হয়ে উঠেছে—নিজেদের নাচ গান আবৃত্তি ওরা নিজেরাই দেখবে নিজেরাই শুনবে।

হঠাৎ আমার মাথাটা খারাপ হয়ে গেল নাকি? আমার আশে পাশে এদিক ওদিক খস্ খস্ শব্দ—ফিস্ ফাস্ কথার আওয়াজ শুনতে লাগলাম যে,—অথচ মানুষ ত ছার একটা টিকটিকি বা একটা আরশোলাও দেখছি না।

চমকে উঠলাম দারুণভাবে। খালি স্টেজ অথচ কথা বলে কে স্টেজের উপরে। বেশ জোর গলাতেই কে স্পষ্ট বললে—"এঁবার আঁমাদের জঁলসা আঁরম্ভ হঁচ্ছে।"

লোকজন কেউ নেই তার উপর নাকী সুরে কথা। হাত পা হিম হয়ে এল, বুকের ভিতরটায় কে যেন সজোরে হাতুড়ি পিটছে। নাকী সুরে কে আবার বললে—আঁজকের জঁলসায় আঁমি মাঁননীয় অঁতিথি শ্রীআঁদিত্য রাঁয়কে সঁভাপতির আঁসন গ্রহণ কঁরার জঁন্য প্রঁস্তাব কঁচ্ছি।"

আর একজন বললে "আঁমি এঁ প্রঁস্তাব সঁমর্থন কঁচ্ছি।"

সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজনের একসঙ্গে চীৎকার—মাঁলা, মাঁলা।

দেখি শূন্য থেকে একগাছি ফুলের মালা এসে আপনি আমার গলায় পরল।

আর কোনও সন্দেহ রইল না। বুঝলাম, অশরীরী মানে ভূতেদের মাঝে এসে পড়েছি। নিরুপায় হয়ে আধমরা অবস্থায় বসে রইলাম।

কে একজন বললে আমার অতি কাছে থেকেই "পঁরিচয় কঁরিয়ে দিঁই। আঁপনার পাঁশে বঁসে শ্রীঁমতী প্রঁমীলা বঁসু বিঁখ্যাত কঁবি—"

আমি ডানদিকে পাশ ফিরে হাত দুটি জোড় করে আন্দাজে নমস্কার করলাম। সঙ্গে সঙ্গে বাঁ পাশ থেকে নাকী সুরে খিল খিল করে হাসি। মেয়েলি গলায় কে হেসে বললে—"আঁমি আঁপনার বাঁ পাশে, আঁপনার ডাঁন পাঁশে অঁধ্যাপক জঁনার্দন মাঁইতি।"

বাঁ পাশ ফিরে আবার নমস্কার করলাম—

পরিচয় পালা শেষ হলে সুরু হল জলসা। প্রথমেই ছোট একটি মেয়ের গান রবীন্দ্র সঙ্গীত, নাম "ল্যাবেঞ্চুস্ ফুলটু।" অ্যানাউন্সার জানাল যে এই মেয়েটি আজ মাত্র ক' দিন হোলো জীবনের পরপারে চলে এসেছে। তাতে মানুষের ক্ষতি হয়েছে খুব, কিন্তু ওদের মানে ভূতেদের লাভ হয়েছে যথেষ্ট অমন একটা মিষ্টি গলার গাইয়ে তাদের মধ্যে পেয়ে।

মেয়েটির গান শেষ হোলো।

সুরু হোলো এক বিখ্যাত ভূতের তাণ্ডব নৃত্য। নটরাজের নাচ নাচছে, কিছু দেখতে পাচ্ছি না শুধু ধুপধাপ দমাস দমাস শব্দ শুনতে লাগলাম। সমস্ত স্টেজ কাঁপছে। রক্ত মাংসের পা নেই তবুও চারিদিক থেকে সে কী নাকী

সুরে উল্লাসধ্বনি। ভয়ে কাঁপতে লাগলাম। আনন্দের চোটে হলের সব ভূত যদি এক সঙ্গে নাচ সুরু করে দেয়!

যাই হোক, তাণ্ডব নৃত্য শেষ হোলো শেষ পর্যন্ত! অন্য ভূতেরা আর নাচল না আনন্দের চোটে এই যা রক্ষে।

এবার উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত, যাকে বলে কলোয়াতী গান। গান ধরলেন সঞ্জয় ব্যানার্জী।

জীবনের পরপারে এসেও দেখি ওরা আগেকার নামগুলিই বাহাল রেখেছে। এ সঞ্জয় ব্যানার্জিকে ত আমি হাড়ে হাড়ে চিনতাম। যখন বেঁচেছিলেন তখন ভদ্রলোক কী দুর্জয় গাইয়ে ছিলেন। গান গাইবার সময় যেমনি করতেন অসহ্য চিৎকার আর তেমনি ছুঁড়তেন দুটো হাত সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে, মানে চতুর্দিকে। একবার এক গানের আসরে ওঁর গান গাইবার সময় আমি ছিলাম সামনে বসে। গাইতে গাইতে একখানা তান দিতে গিয়ে লাফিয়ে উঠে বসে তাঁর বাঁ হাতটা এমনভাবে তিনি সামনে ছুঁড়ে দিলেন যে, সেই হাত এসে আমার ডান চোখে লাগল সজোরে—ফলে তিনটি মাস ব্যাণ্ডেজ করে রাখতে হোলো চোখটিকে। মারা গেছেন শুনেছিলাম এই দুর্জয় গাইয়ে। নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম। আজ আবার তাঁর গান শুনতে হবে এই ভূতেদের জলসায়। ভয় হলো আবার যদি চোখে লাগিয়ে দেয়। পরে ভাবলাম না স্টেজ থেকে অনেক দূরে বসে আছি। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, কিন্তু কে জানে, বাবা ভূতের হাত কতখানি লম্বা। শেষ পর্যন্ত ভয় কেটে গেল। ওঁর ত এখন শুধু হাওয়ার শরীর, হাওয়ার হাত পা হওয়াতেই ছুঁড়ছেন, লাগবার ভয় নেই!

কালোয়াতী গান তো শেষ হোলো। এবার আবৃত্তি। অশরীরী সমিতির সম্পাদক শ্রীপ্রণবেশ চক্রধারীর আবৃত্তি—রবীন্দ্রনাথের দেবতার গ্রাস। কী সর্বনাশ! 'দেবতার গ্রাস' ভূতেদের মাঝেও এসে পৌঁছেচে। কী কুক্ষণে রবীন্দ্রনাথ এই 'দেবতার গ্রাস' লিখেছিলেন। আমরা মানুষের জগতে তাকে পচিয়ে ছেড়েছি, এবার ভূতেরাও পচাতে সুরু করেছে।

দেখতে পেলাম না আমার বিগত দিনের প্রিয় শিষ্য প্রণবেশ চক্রবর্তীকে। দুঃখ হোলো—কী আর করা যাবে। অতি বিনীতভাবে আমার কাছে তার সবকিছু শিক্ষালাভের কথা সকলকে জানিয়ে সে সুরু করল—"গ্রাঁমে গ্রাঁমে

সেঁই বাঁর্তা রঁটি গেঁল ক্রঁমে—প্রায় পনরো মিনিট ধরে নাকী সুরে চলল সেই আবৃত্তি।

আবৃত্তি থামতেই চারদিক থেকে শোনা যেতে লাগল—চঁমৎকার, চঁমৎকার কী সুঁন্দর কি সুঁন্দর—"

এরপর দ্বৈতকণ্ঠে এক পুরুষ ভূত আর এক মহিলা ভূত আরম্ভ করলেন আধুনিক গান—'ডবল' নাকী সুরে অনেকক্ষণ গেয়ে তবে থামল ওরা দু'জন।

গান থামতে শোনা গেল—এবার শ্রীমতী দোলা রায়ের মণিপুরী নৃত্য। এ নাকি খুব সুন্দরী দেখতে ছিল আর নৃত্যে সে নাকি মোহিত করে দিয়েছিল সমস্ত দর্শককে—যখন সে বেঁচেছিল। এখন আর তাতে লাভ কী। শুধু ত ঘুঙুরের আওয়াজই পেলাম—চারিদিকে, কিন্তু প্রচণ্ড হর্ষধ্বনি ওদের মাঝে।

নাচ শেষ হোলো। তারপর চলল একটার পর একটা অনুষ্ঠান—সকলেই বাঁচা অবস্থায় মানুষদের মধ্যে ছিলেন নাকি নামকরা শিল্পী। সেতার বাজনা হোলো আলি মহম্মদের, তারপর হেনা মজুমদারের ভজন, তারপর নরেশ ঘোষের তবলা-লহরা—এমনি কত কী।

এর মধ্যে মধ্যে আবার আমার বাঁ পাশের কোনও এক মহিলা অশরীরী বোধ হয় সেই বিখ্যাত কবি প্রমীলা বসুই জিজ্ঞাসা করছিলেন—"কেঁমন লাঁগছে?"

আমিও বোধ হয় খানিকটা ভয়ে আর খানিকটা সঙ্গগুণে নাকী সুরেই উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলাম—"চঁমৎকার, চঁমৎকার, ভাঁরী সুঁন্দর—"

এদিকে মনে মনে প্রাণপণে মা কালীকে ডাকছিলাম—"এদের জলসা শেষ করিয়ে দাও মা—এরা ত সব তোমার আর তোমার স্বামী, বাবা ভূতনাথের অনুগত। এবারকার মত প্রাণে বাঁচাও মা—"

যাক, শেষ পর্যন্ত জলসা শেষ হোলো এক সময়—ভূতেদের জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে সমবেত কণ্ঠে। ওরে বাবা! সব ভূত একসঙ্গে!

জলসার শেষে সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পালা। ওদের একজন আমাকে নানাভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষকালে বললে যে শ্রীপ্রণবেশ চক্রধারীর মত গুণীকে অশরীরীদের মধ্যে পেয়ে তারা ধন্য হয়ে গেছে। সেই প্রণবেশ চক্রধারীর যিনি মহান গুরু সেই আদিত্য রায়কে তাদের মধ্যে অতি শীঘ্র পাওয়ার জন্য সমস্ত অশরীরীরা সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করবে।

শুনে আমার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে যাচ্ছে, মনে হোলো। দর দর ধারে সমস্ত শরীর থেকে ঘাম ঝরতে লাগল—মাথা ঘুরতে লাগল বোঁ বোঁ করে, হৃৎপিণ্ডটা চলা বন্ধ হয়ে যায় বুঝি।

আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে আমি পাগলের মত হল থেকে ছুটে বেরিয়ে এলাম। শুধু বেরিয়ে এলাম তাই নয়, টালিগঞ্জের সেই সুদূর প্রান্ত থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলাম। প্রায় তিন মাইল রাস্তা জল কাদা ভেঙে ছুটে বাড়ীতে এসে মরার মত বিছানায় নেতিয়ে পড়লাম।

সেই থেকে মাঝে মাঝেই আমার বুকটার ভিতর কী রকম একটা ব্যথা করে, সমানে মনে হয়, ওরা মানে ঐ অশরীরীরাও, কি এখনও সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করছে আমাকে ওদের মধ্যে পাওয়ার জন্যে ?



হরিবিলাসের স্বাস্থ্য পরিবর্তন

যমে মানুষে টানাটানি যাকে বলে হরিবিলাসের জীবনটা নিয়ে স্রেফ্ তাই হয়ে গেল। যম হেরে যাওয়ার ফলে হরিবিলাস কোনও রকম করে সেরে উঠল সেবার দারুণ অসুখ থেকে।

ডাক্তার বললেন—"অসুখ সারল বটে কিন্তু শরীরটাও যে সারান দরকার নইলে সংসার থেকে সরে পড়তেও হয়ত হতে পারে—অসুখ সারা সত্বেও।"

ডাক্তার বিধান দিলেন—কলকাতার বাইরে কোথাও একটা স্বাস্থ্যকর স্থানে গেলেই শুধু হবে না, বেশ পুষ্টিকর খাদ্যেরও প্রয়োজন কিছুদিন।

ডাক্তার ত' বিধান দিয়েই নিশ্চিন্ত—কিন্তু বিধির বিধান যে ঠিক তার উল্টো!

হরিবিলাস মনে মনে শুধু ভাবে—কত লোক ত' বড়লোক আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবদের স্কন্ধে ভর করে কত জায়গা ঘুরে আসে, কি রকম 'চর্বচুষ্যলেহ্যপেয়'র বন্দোবস্ত করে নেয় দিনের পর দিন। তার ভাগ্যে কি একজনও ঐ রকম বড়লোক আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব নেই—!!

হরিবিলাস মনে মনে একবার দিগ্‌ভ্রমণ করে আসে। উঁহু,একজনও সে রকম আত্মীয় বা বন্ধুর কথা মনে পড়ে না যার কাঁধে ভর করে গিয়ে শরীরটা তার সারিয়ে নিয়ে আসতে পারে সে।

আত্মীয় বলতে তার এক কালা খুড়ো আর এক বাতগ্রস্ত মেসো। তা এঁরা ত' হরিবিলাসের কাঁধে ভর করে হরিবিলাসকেই ভরাডুবি করবার মতলবে আছেন।

তবে?

বন্ধুবান্ধব?—ওরে বাবা! হরিবিলাসের পকেট দু'টোকেই তারা চিরকাল নিজেদের পকেট মনে করে এসেছে আজ পর্যন্ত!—উঁহু, চল্‌ল না। হরিবিলাস প্রস্তুত হতে লাগল সংসার থেকেই সরে পড়বার জন্য। কোন উপায়ই নেই তা ছাড়া।

কিন্তু সরে পড়তে হল না বোধ হয়।

সদয় হলেন বোধ হয় অদৃষ্ট দেবতা। কলেজের বড়লোক সহপাঠী প্রমথেশের সঙ্গে হঠাৎ সেদিন ওর দেখা হয়ে গেল বহুদিন পরে—চৌরঙ্গীর মোড়ে।

হরিবিলাসের শরীরের অবস্থা দেখে এবং তার কাছ থেকে সব কিছু শুনে প্রমথেশের মাথায় হঠাৎ পরোপকারের নেশা চেপে গেল। সে জিদ্ ধরল—হরিবিলাসকে যেতে হবে তাদের সঙ্গে চেঞ্জে এবার। এই ত' দিন দশেক পরে তারা বাড়ীশুদ্ধ সবাই চলেছে এক পাহাড়ী দেশে হাওয়া বদ্‌লাতে।

হরিবিলাস ইতস্ততঃ করে বলে শুধু—"আমি একজন বাইরের লোক—"

প্রমথেশ তার সে কথায় বাধা দিয়ে উচ্ছ্বসিত হাসি হেসে বলে,—"বাইরের লোক, তা কি হয়েছে? আমাদের বাড়ীর ও সব হাঙ্গামা নেই। আমার আরও তিন চারটি বন্ধু যাচ্ছে, তারাও ত' বাইরের লোক,—কোন অসুবিধা হবে না। যেতেই হবে আপনাকে—আমি আজকেই গিয়ে আমার মাকে আর আমার বোনেদের জানিয়ে দেব, আমাদের কলেজের ফার্স্ট বয় এবার আমাদের সঙ্গে যাবেন। খুব খুশী হবেন তাঁরা—"

হরিবিলাসকে রাজি করে প্রমথেশ বিদায় নিল সেদিন। হরিবিলাস বাড়ী এসে খানিকটা চুপ করে ভাবল, বলে—এ সত্যি, না স্বপ্ন! কতদিন

আগে এক সঙ্গে পড়েছিল শুধু—হঠাৎ সেই সূত্রে আজ এতখানি আত্মীয়তা! হবেও বা! বিধি যখন দেন তখন মাটি ফুঁড়েও দেন।

দশটা দিন কোথা দিয়ে যে হরিবিলাসের কেটে যেতে লাগল তার ঠিক নেই। ও দিনরাত শুধু দেখতে লাগল—সুন্দর সুন্দর পুষ্টিকর খাদ্য খেয়ে দিনের পর দিন ওর শরীরের কি দ্রুত উন্নতি হচ্ছে! দেখতে দেখতে ক'দিনের মধ্যে ওর ঐ রুগ্ন দেহ কি সুন্দরই না হয়ে উঠেছে! কল্পনায় ও ওর নিজের 'নব কলেবর' দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল প্রায়। ও ভাবল এখন ওর এই চেহারার একটা ফটো তুলে রাখলে কেমন হয়? চেঞ্জ থেকে ফিরে এসে আর একটা ফটো! ঘরে টাঙান থাকবে—দুটো ফটো পাশাপাশি, লেখা থাকবে তলায়—'চেঞ্জের পূর্বে এবং পরে'।

যাই হোক, কল্পনা থেকে বাস্তবের দিন এসে গেল। হরিবিলাস সেদিন যাত্রা করল প্রমথেশদের পাহাড়ী দেশের উদ্দেশে।

সকালবেলা পৌঁছল গিয়ে সে প্রমথেশদের বাড়ী। প্রমথেশ এসে অতি সাদরে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেল হরিবিলাসকে, সুন্দর একটি ঘর দেখিয়ে দিল তাকে—সেইটিই তার থাকবার জন্য ঠিক করা হয়েছে।

পাশের 'বাথরুম' থেকে বেশ করে হাত মুখ ধুয়ে এসে কাপড় বদলে হরিবিলাস বসল একটা জানালার ধারে। দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে, জানালা দিয়ে ঝির্ ঝির্ করে হাওয়া আসছে, তার মাঝে সামান্য শীতের আমেজ। ওর মনটা এক অভূতপূর্ব আনন্দে ভরে উঠল।

হঠাৎ ওর খেয়াল হল কে যেন ওকে ডাকছে। তাকিয়ে দেখল, বছর নয়-দশের ছোট্ট একটি সুন্দর মেয়ে বলছে অতি মিষ্টি করে—"আপনার ব্রেকফাস্ট কি এখানে পাঠিয়ে দেবে, না আপনি ভিতরে আসবেন? জিজ্ঞাসা করলেন বড়দিদি।"

হরিবিলাস প্রথমটায় যেন একটু গণ্ডগোলে পড়ে গেল। "ব্রেকফাস্ট!" হঠাৎ ওর খেয়াল হল, বললে, "ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানেই পাঠিয়ে দিতে বল।" মেয়েটি তৎক্ষণাৎ চলে গেল ছুটে বাড়ীর ভিতর।

একটি বেয়ারা এসে একটি ছোট্ট সুন্দর টিপয় রেখে গেল। হরিবিলাস ভাবল—'ফাস্ট'ই বটে! সমস্ত রাত্রি ট্রেণে কিছু খায় নি, খিদেয় প্রাণ গেল প্রায়। যাই হোক, ঐ টিপয়ের উপর এখনই ত' আসছে ডিস-ভরা কত কি!

তার চিন্তা ভঙ্গ করে বেয়ারা নিয়ে এল 'ট্রে'তে করে এক পেয়ালা চা এবং একটি ডিসে টোস্ট এবং ওমলেট। টোস্ট এবং ওমলেটের পরিমাণ দেখে হরিবিলাসের প্রথমটা একটু ধাঁধা লেগে গেল। পাঁউরুটির একটি পাতলা 'স্লাইস'কে লম্বালম্বি চার ভাগ করে তার একভাগ দেওয়া হয়েছে, আর ওমলেটের আয়তন দু' আঙ্গুল লম্বা, দু আঙ্গুল চওড়া। কি সর্বনাশ! এতে যে ওর পেটের একটা কোণও ভরবে না! এরা কি সবাই এইটুকু করেই খায়?

হঠাৎ ওর খেয়াল হয়—কানের মধ্যে 'ব্রেকফাস্ট' কথাটা বেজে ওঠে। ওর খেয়াল হয় ও ত' শুনেছিল 'ফাস্ট' 'ব্রেক' করতে হলে অল্প জিনিস খেয়েই করতে হয়—বেশী খাওয়া শরীরের পক্ষে নাকি ক্ষতিকর—মহা ক্ষতিকর। তাই হবে। ও খানিকটা নিশ্চিন্ত হয় তবু।

একটা নভেল নিয়ে বসে ও। পড়তে পড়তে ঘণ্টা দু'য়েক কেটে যায়—এর মধ্যে গুটিকতক ছোট ছেলেমেয়ে ঘুরে গেছে, প্রমথেশ একবার এসে জেনে গেছে হরিবিলাসের কোন কষ্ট হচ্ছে কিনা।

বেলা প্রায় এগারোটা বাজে।

সেই ছোট্ট মেয়েটি দূতরূপে আবার আসে, অতি নম্রভাবে জিজ্ঞাসা করে—"স্নানের যোগাড় করে দেবে কি?"

হরিবিলাস নভেল রেখে লাফিয়ে ওঠে। বলে, "নিশ্চয়, নিশ্চয়!"

স্নানের পরের বন্দোবস্তটার জন্য ওর দেহ-মন এক সঙ্গে লালায়িত হয়ে ওঠে!

স্নানের পরেই আহারের জন্য ওর ডাক আসে—এবার ডাকতে আসেন প্রমথেশের সেজ বোন ললিতা।

হরিবিলাস অতি সন্ত্রস্তভাবেই ললিতার পিছু পিছু বাড়ীর ভিতরে আসে; এসে দেখে প্রকাণ্ড 'ডাইনিং রুম'—তার মাঝে প্রকাণ্ড ডাইনিং টেবিল, তারই চারিদিকে চেয়ারে বসে প্রমথেশের মা ও বোনেরা, প্রমথেশ এবং তার কয়েকটি বন্ধু—আন্দাজে বুঝে নেয় ও।

যাই হোক, প্রথমে টেবিলে খেতেই ওর মহা অসুবিধা। দ্বিতীয়তঃ, পাঁচজনের মাঝে, বিশেষতঃ অন্য বাড়ীর মেয়েদের সামনে খাওয়া ওর পক্ষে এক দুরূহ ব্যাপার। প্রমথেশের বোনেরা আবার, ও শুনেছিল, সব এম. এ. বি. এ. পাশ। মহা শঙ্কিত ও লজ্জিত হয়ে ও বসল ওর চেয়ারে।

ঠাকুর এসে ওর সামনে একটা পরিষ্কার থালা রেখে গেল। রূপোর থালা, তার ধারে সূক্ষ্ম কাজ করা।

ও লজ্জায় মাথা নীচু করে বসেছিল এতক্ষণ। সামনে থালাটার খানিক অংশ চোখে পড়তেই ওর ক্ষিধেটা দ্বিগুণ হয়ে উঠল। অপেক্ষায় রইল কখন ভাত নিয়ে আসবে।

কিন্তু কই, ভাত ত' আসে না!—হঠাৎ কানে এল,—"খেতে বসুন হরিবিলাসবাবু!"

এ রসিকতার মানে কি ও ঠিক বুঝল না, ভাত নেই অথচ খেতে বসতে হবে?—তার মানে?

ভাল করে মুখ তুলে তাকাতেই ও দেখল থালার এক কোণে বড় চামচের দু' চামচ আন্দাজ ভাত সাজান রয়েছে—ওর সেটা এতক্ষণ চোখেই পড়ে নি। চারিদিকে তাকিয়ে দেখল—সকলের পাতেই ঐ একই পরিমাণ ভাত দেওয়া হয়েছে। ও প্রথমটায় কিছুতেই বুঝে উঠতে পারল না—এ ক'টা ভাত দেওয়ার মানে কি। শেষটায় হঠাৎ ওর মনে বহুদিন আগের একটা স্মৃতি ভেসে উঠল। শান্তিপুরে এক গোস্বামী-বাড়ী গিয়েছিল সে দু'দিনের জন্য। তাঁদের বাড়ীর থালায় প্রথমে সামান্য দু'টো 'সাদা ভাত' দেওয়া হত। ঠাকুরের প্রসাদ বুঝি সে ভাত ক'টি—প্রথমে সেই ভাত ক'টি মুখে দিয়ে তারপর অন্য সব খেতে হত।

ও ভাবল—এও বোধ হয় সেই রকম, প্রমথেশের মা বোধ হয় পুজো-টুজো করেন—

কিন্তু ওর এ সমস্ত ধারণাই ভুল দেখল ও। কারণ, ও শুনতে পেল, ওর পাশেই বেশ নম্রভাবে সামান্য কথা কাটাকাটি চলেছে। প্রমথেশের এক বন্ধু বলছে, অতি বিনম্রভাবেই বলছে—"এতগুলি ভাত আমি খেতে পারব না ললিতা দেবী!"

প্রমথেশের বোন ললিতা একটু অনুযোগের সুরেই বলছেন—"না না, এমন বেশী কিছু ভাত দেওয়া হয়নি। আপনি কাল আপত্তি করেছিলেন বলে আপনাকে আজ দেড় চামচ ভাত দিতে বলেছি।"

সে ভদ্রলোক একটু হেসে চুপ করে গেলেন।

প্রমথেশের মেজ বোন মিনতি হরিবিলাসের দিকে তাকিয়ে বললেন একটু

হেসে—"হরিবিলাসবাবু, আপনি কিন্তু একটি ভাতও ফেলতে পারবেন না—সমস্ত খেতে হবে কিন্তু।

চমৎকার অনুরোধ। হরিবিলাসের সমস্ত শরীর অবশ হয়ে আসছে ক্ষিধেয় এবং হতাশায়।

ঠাকুরের হাত থেকে ডালের ছোট একটি কাঁচের বাটি নিয়ে ললিতা দেবী ডাল পরিবেশন করতে লাগলেন।

অনুরোধ এল একটি চেয়ার থেকে—"আমাকে ওন্‌লি হাফ্ স্পুনফুল—আধ চামচে ডাল দেবেন?"

ললিতা দেবী বললেন—"এক চামচ দেব না?"

সেই চেয়ারই বলল, একেবারে আঁতকে উঠে—"ওঃ, ইট্ ইজ টু মাচ—অত বেশী খাওয়া কি সম্ভব?"

আর এক চেয়ার থেকে একটি মেয়ে বললেন—"ললিতা, আমাকে ডাল দিও না।"—একটু থেকেই বললেন—"আচ্ছা দাও—কোয়াটার স্পুনফুল"। ললিতা দেবী ডালের বাটি হাতে ঘুরে আসছেন হরিবিলাসের দিকে, হরিবিলাসের পাশের চেয়ার থেকে বলল প্রমথেশের একজন বন্ধু—"দেখুন ললিতা দেবী, আমাকে হাফ্ স্পুনফুল দেবেন—তবে টেব্‌ল স্পুন নয়, চায়ের চামচে—হাফ্ টি-স্পুনফুল দেবেন।"

হরিবিলাসের সংজ্ঞা লোপ পাবার যোগাড়! ও শুনল কে যেন জিজ্ঞাসা করছে ওকে—"আপনাকে এক চামচ ডাল দিই?" ও বোধ হয় ঘাড় নাড়ল ডান দিকে। তারপর ওর কানে আসতে লাগল—কেউ বলছে, "দেখুন, আমাকে এক পিস ডাঁটা দেবেন,—" কেউ বলছে—"কিছু যদি মনে না করেন তাহলে আমাকে হাফ্ পিস—না না, কোয়াটার পিস মাছের ফ্রাই দেবেন···"

হরিবিলাস অন্যের কথা অস্পষ্ট শুনতে লাগল বটে কিন্তু নিজে যে কি বলল তা ওর নিজের কানেই ঢুকল না, আর কি যে খেল সে তাও নিজে জানতে পারল না।

মুখ ধুয়ে কোনরকম করে নিজের ঘরে গিয়ে গায়ে একটা কাপড় দিয়ে সে শুয়ে পড়ল; খানিকক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল কি অজ্ঞান হয়ে পড়ল তা বোঝা গেল না, তবে এইটুকু বোঝা গেল যে সে সজ্ঞানে নেই আর।

জ্ঞান তার ফিরে এল একেবারে বিকেল চারটেয়—প্রমথেশের ডাকে। বলছে সে—"চলুন, চা খেয়ে একটু বেড়িয়ে আসা যাক্। আপনি ত আবার

সাহিত্যিক লোক—খুব ভাল লাগবে আপনার; পাহাড়ের গা দিয়ে নদী বয়ে চলেছে · দেখবেন চলুন।"

চা খেয়ে প্রমথেশের বোনেরা এবং ওর বন্ধুরা, প্রমথেশ, হরিবিলাস সকলেই বেড়াতে বার হল। হরিবিলাসের পা দুটো যেন দুমড়ে আসছে। একটু পরেই ও ফিরতে চাইল।

প্রমথেশের একটি বন্ধু মৃদু বাধা দিয়ে বলল—"না না, আর একটু হাঁটা যাক। ও-বেলা বড় বেশী হেভি খাওয়া হয়েছে।"

হরিবিলাসের পায়ের রক্ত মাথায় উঠে গেল—মনে হল ঐ লোকটার টুঁটি টিপে ধরে বলে শুধু—'সাবধান, সব জিনিসের একটা সীমা আছে তা জেন—' কিন্তু কোনও রকমে নিজেকে সামলে নিল সে।

রাত্রেও খেতে বসে ঠিক সেই 'হাফ্ টিস্পুন' আর 'এক পিস না হাফ্ পিস' পালা চলল।

সমস্ত রাত্রি—সমস্ত রাত্রি ধরে হরিবিলাস ভাবল কি করা যায়! দু মাস থাকব বলে এসেছি, অথচ একদিন থেকেই বা চলে যাই কি করে! বড় খারাপ দেখায় যে!

যাই হোক, আরও দু'দিন কাটল অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে। সেদিন মনে হল ওর যে ও আর বাঁচবে না। নিরুপায় হয়ে সন্ধ্যাবেলা সকলের অগোচরে বার হয়ে পড়ল সে, যদি কোথাও একটা হোটেল বা খাবারের দোকান মেলে। বহুদূর গিয়ে ছোট একটা পরোটার দোকান মিলল। দোকান মিলল কিন্তু খাবার মিলল না।

দোকানী বলল—'তিনবাবু সমস্ত পরোটা খেয়ে গেছেন।' হরিবিলাস চমকে উঠল, জিজ্ঞাসা করল, "তিনবাবু? কি রকম দেখতে?"

দোকানী বর্ণনা দিল; বলল 'দিন পনর হল রোজ আসেন।' হরিবিলাস গর্জে উঠল নিজের মনেই—শয়তানের দল! এখানে গাদা গাদা পরোটা খেয়ে প্রমথেশের বোনদের সামনে 'হাফ পিস' চালান হয়। মনে মনে ভাবল—দাঁড়াও, প্রমথেশের মাকে আর বোনেদের চুপি চুপি ডেকে নিয়ে এসে দেখাচ্ছি ঐ ষণ্ডাগুলি হাফ পিস আর টিস্পুনফুল খেয়ে বাঁচতে পারে না! ওঁরা স্ত্রীলোক ওঁদের হয়ত অল্প খেলেই চলে, কিন্তু—

যাই হোক—সে সব ত পরে হবে। সে রাত্রে যে হরিবিলাসের মৃত্যু শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে—ক্ষুধা রাক্ষসী ধীরে ধীরে গ্রাস করছে মনে হচ্ছে। রাত তখন

প্রায় বারটা। ও মরিয়া হয়ে অন্ধকারে পথ খুঁজে খুঁজে চলল খাবার ঘরের দিকে।

একটু খুট করে শব্দ হতেই পাশের ঘর থেকে প্রমথেশের মা জিজ্ঞাসা করলেন, "কে রে? চোর না কি?"

ওঁর বোধহয় ধারণা যে চোর হলেও মিথ্যাবাদী না হতে পারে। হয়ত বলবে সে, "আজ্ঞে মা ঠাকরুণ, আমি চোরই বটে।"

যাই হোক আর এগুনো উচিত নয়, হরিবিলাস আস্তে আস্তে ফিরে এল।

আরও আধ ঘণ্টা কেটে গেল। নাঃ, এভাবে আর থাকা যায় না। প্রমথেশের মা এতক্ষণে নিশ্চয়ই ঘুমিয়েছেন। হরিবিলাস আবার চলল খাবার ঘরের দিকে।

প্রায় পৌঁছেছে—এমন সময় হঠাৎ দূরে একটা টর্চের আলো জ্বলে উঠল।

হরিবিলাস চমকে উঠল, তার পরেই সে তাড়াতাড়ি একটা দরজার আড়ালে গিয়ে লুকাল।

সেখান থেকে টর্চের আলোতে—অস্পষ্ট আলোতে দেখল সে—প্রমথেশ এসে খাবার ঘরের খাবারের আলমারি খুলে কি সব খেয়ে নিল তাড়াতাড়ি; তারপর আলমারি বন্ধ করে চলে গেল।

হরিবিলাস ভাবল—ও শয়তান, তুমিও! তা ত হবেই, হাফ পিস খেয়ে কি বাবা ঐ চেহারা হয়!

দরজার পাশ থেকে বার হতে যাচ্ছে—এমন সময়ে শুনল চুড়ির শব্দ। আবার লুকাল দরজার পিছনে। এবার দেখল—প্রমথেশের তিনটি বোনই এলেন পর পর—এবং প্রমথেশ যা করে গেছে তাঁরাও তাই করলেন।

হরিবিলাসের সমস্ত রহস্য জল হয়ে গেল। তবে তখন ওর আর অন্য কিছু ভাববার সময় ছিল না; সে তাড়াতাড়ি দরজার পাশ থেকে বার হয়ে এসে খাবারের আলমারির দরজা খুলে ফেলল। কিন্তু হায় অদৃষ্ট! সমস্ত ফাঁকা: ঠিক মাপ করাই ছিল বুঝি!

হরিবিলাস রাত্রিটা কোনও রকমে কাটিয়ে সকালে স্যুটকেসটি গুছিয়ে নিয়ে সকলের কাছে বিদায় নিতে গেল। বলল—"বিশেষ দরকার পড়েছে একটা—"

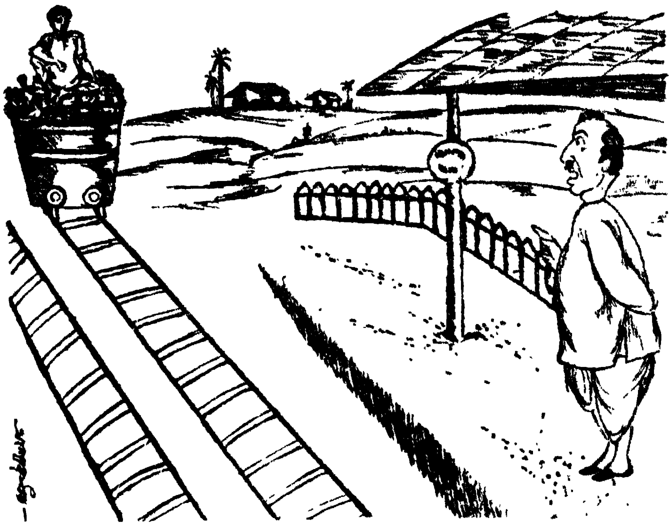
সকলেই প্রায় একবাক্যে বলে উঠলেন—"সে কি! এর মধ্যেই চললেন কেন?"

প্রমথেশের মেজ বোন বললেন, "আপনার বোধ হয় খাওয়া-দাওয়ায় অসুবিধা হচ্ছিল ?—"

হরিবিলাস একটু হেসে অতি বিনীতভাবে বলল—"আজ্ঞে, না না, বরং একটু হেভি—বেশী খাওয়া হয়ে যাচ্ছিল—আচ্ছা নমস্কার।" বলেই সে বার হয়ে পড়ল।

গোটা কয়েক স্টেশন পরেই একটা স্টেশনে এসে দেখল—পরোটা আর আলুর দম বিক্রী করছে। হরিবিলাস হাঁকলে—"এই দশঠো পরোটা আউর সের ভর আলুর দম—"

কানে তখনও বাজছে—'হাফ স্পুন্‌ফুল—না না, কোয়ার্টার স্পুন্‌ফুল দেবেন আমাকে।'



মামা-ভাগ্নে

নিশুর মামা—ভীষণ, ভয়ঙ্কর মামা। চেহারা ভয়ঙ্কর নয়, লোকটি ভয়ঙ্কর! মোটা সোটা বেঁটে-খেঁটো লোকটি, মাথায় টাক, মুখে প্রকাণ্ড দাড়ি এবং গোঁফ। তাকে ভয় করে না এমন প্রাণী নিশুদের বাড়ীতে একটিও নেই। নিশুর মামী থেকে বাড়ীর কুকুরটি পর্যন্ত তাঁকে ভয় করে। আর ভয় করবেই বা না কেন? তাঁর কাছে যে সংসারে ভাল কেউ নেই। তাঁর ধরণা সবাই সব সময় তাঁর অসাক্ষাতে একটা না একটা অন্যায় কাজ নিশ্চয়ই করছে। কোথায় যে তিনি কখন আছেন তার কিছু ঠিক নেই। এই হয়তো তেতলায় ছেলেদের পড়ার ঘরের পিছনে লুকিয়ে বসে আছেন, ছেলেরা পড়তে পড়তে গল্প করছে কি না শুনছেন; পরক্ষণেই হয়তো একেবারে নীচে রান্নাঘরের জানালার ফুটোয় চোখ দিয়ে দাঁড়িয়ে ঠাকুর চুরি করে কিছু খাচ্ছে কি না দেখছেন। আবার পরের মুহূর্তেই হয়তো স্নানের ঘরের কাছে কান পেতে দাঁড়িয়ে কেউ স্নানের ঘরে স্নান করতে করতে গান করছে কি না শুনবার জন্য। দিন রাতের মধ্যে খাওয়া আর শোয়ার সময়টুকু ছাড়া তিনি সব সময় বাড়ীময় ঘুরে বেড়াচ্ছেন,

পাছে কোনও সময় কেউ অন্যায় করে ফেলে। শব্দ হবে বলে চামড়ার জুতো পায়ে দেন না। রবারের চটি পরে বেড়ান। কেউ একটু কোনও দোষ করেছে কি অমনি তার ভীষণ শাস্তি—শুধু ভীষণ শাস্তি নয়, অদ্ভুত শাস্তি। একেই তিনি কথা খুব কম কন, তার উপর শাস্তির সময় আরও কম কথা। তাঁর মুখ থেকে শুধু বন্দুকের গুলির মত ছিটকে বার হয়ে আসে শাস্তির অর্ডার। কারো 'না' বলবার জো নেই, সঙ্গে সঙ্গে হুকুম তামিল করতে হবে।

কখনও বললেন হয়তো 'এক পা এক কান', অর্থাৎ এক পায়ে দাঁড়িয়ে এক কান ধরে থাকতে হবে; কখনও বললেন হয়তো 'চেয়ার' অমনি চেয়ারের মত হয়ে আধো বসা, আধো দাঁড়ান অবস্থায় থাকতে হবে। কখনও হয়তো আদেশ হল 'দুবেলা বন্ধ' অর্থাৎ দু'বেলা না খেয়ে থাকতে হবে। এমন কি যদি বলেন 'ব্যাঙ' অমনি পায়ের উপর ভর করে দুই হাঁটুর মধ্যে দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে দুটি কান ধরে উঁচু হয়ে বসে থাকতে হবে। এমনি অদ্ভুত অদ্ভুত আরও কত কি!

এসব শাস্তি যে শুধু ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের তা নয় নিশুর মামীমা থেকে বাড়ীর ঠাকুর চাকর সকলকেই এসব শাস্তি গ্রহণ করতে হয়। এই তো সেদিন নিশুর মামা তামাক খাবেন বলে কল্‌কেটিতে তামাক সেজে মাটির উপর রেখে দিয়েছিলেন। নিশুর মামীমা কি একটা কাজে সেখান দিয়ে তাড়াতাড়ি যাচ্ছিলেন, হঠাৎ দেখতে না পাওয়ায় পায়ে লেগে কল্‌কেটা উল্টে যায়। মামীমা ভয়েতে চোখে সর্ষের ফুল দেখলেন, গুরু-গম্ভীর একটা শব্দ কানে এল 'ব্যাঙ'। ব্যস, মামীমা বাড়ীর গিন্নী, বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি তবুও তক্ষুনি আর একটি কথা না বলে ব্যাঙ হয়ে বসে পড়লেন। চারিদিকে ছেলেপিলে, নাতি-নাতনী ঠাকুর চাকর-বাকর তার মাঝে 'ব্যাঙ'! লজ্জার যার শেষ নেই। ঠাকুরটা সেদিন মাছের ঝোলে বুঝি একটু নুন বেশী দিয়েছিল, তাকেও দু'ঘণ্টা ব্যাঙ, আর এক ঘণ্টা চেয়ার হয়ে থাকতে হয়েছিল। এ রকম তো হচ্ছেই দিন রাত। এক এক দিন বাড়িতে একটা দেখবার মত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। যে দিন হয়তো অনেকের দোষ একসঙ্গে ধরা পড়ে সেদিন বাড়ীময় কেউ চেয়ার, কেউ ব্যাঙ, কেউ এক পা এক কান, ছেলেমেয়ে—ছোট বড়, ঠাকুর চাকর সকলে। সে একটা দৃশ্য!

এ হেন যে নিশুর মামার বাড়ী, সেই মামার বাড়ীতে সব জেনে-শুনে পূজার ছুটিতে বেড়াতে এল নিশু। সকলে শুনে বলবে হয়তো যে আশ্চর্য সাহস তা নিশুর! কিন্তু নিশু নিজেও তো বড় একটা কেউ-কেটা ছেলে নয়। ধড়িবাজ ফাঁকিবাজ ভীষণ ভণ্ড, এক কথায় বিচ্ছু ছেলে। প্রত্যেকটি বছর প্রমোশন পেয়ে পেয়ে ফার্স্ট ক্লাস অর্থাৎ ক্লাস টেন পর্যন্ত উঠেছে অথচ কখনও বইএর পাতা খোলে নি বাড়ীতে। শুধু টুকে পাস করেছে। ওদের স্কুলের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমাস্টার অতুলবাবু রবার্ট ব্রেকের বাবা, তাঁর চোখ বাঁচিয়ে টোকে এমন ছেলে বিরল। কেউ তেতলায় টুকলে একতলা থেকে তাঁর টনক নড়ে। সেই অতুলবাবু শত চেষ্টাতেও তাকে কখনও ধরতে পারলেন না। সে প্রত্যহ কলকাতায় ট্রাম-বাসে ঘুরে বেড়ায়, পকেটে অথচ কানা কড়িও থাকে না। থাকলেও কখনও ভাড়া দেয় না। খুব বেশী দিন যদি কেউ তাকে না দেখে তা হলে ভাববে এমন ছেলে আর হয় না, মুখে মধু ঝরে। যাই হোক, পূজার ছুটিতে এই নিশু এল তার মামার বাড়ী মধুপুরে বেড়াতে।

বাড়ীতে ঢুকেই মামাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত, পায়ের উপর থেকে আর উঠতেই চায় না। তার মামা বল্লেন, "হয়েছে হয়েছে, ওঠো।" নিশু উঠে দাঁড়াল; উঠবার সময় তার মামা দেখতে না পান এমনি ভাবে নিজের কোটের পকেটে ছোট্ট একটা ধাক্কা দিল, সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে একটা বই বার হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। সে যেন মহা লজ্জিত এবং ভীত এমনি ভাবে তাড়াতাড়ি বইখানি তুলে লুকোতে গেল। অমনি মামা জলদগম্ভীর স্বরে বল্লেন "কি বই ওটা? দেখি।"

নিশু বল্লে—"না, না, ও এমনি একটা বই"।

এবার বেশ কড়া সুরেই মামা বল্লে—"দাও শীঘ্রি। নিশ্চয় কোনও নভেল বা গল্পের বই।"

নিশু ভয়ে ভয়ে বইটা এগিয়ে দিল তাঁর হাতে। তিনি অবাক হয়ে গেলেন, বল্লেন—"একি, এ যে গীতা! পকেটে গীতা কেন?"

নিশু যেন মহা লজ্জিত, বল্লে—"আজ্ঞে, বাবা বলতেন আমাদের ছেলেদের গীতার উপদেশ অনুসারে চলা উচিত, আর সব ছেলেরই মাঝে মাঝে গীতা পড়া উচিত। আমি তাই প্রায়ই গীতা পড়ি। ট্রেণে আসতে আসতে গীতা পড়ছিলাম, পকেটেই রয়ে গেছে।"

মামা খুসী—ভারী খুসী। ভাবলেন "চমৎকার ছেলে তো! আমাদের বাড়ির ছেলেগুলো পড়ার সময় লুকিয়ে লুকিয়ে গল্পের বই নভেল পড়ে—আমি বাড়ীতে থাকা সত্ত্বেও এবং এত শাস্তি দেওয়া সত্ত্বেও। আর এ ছেলে ট্রেণে যেখানে গল্পের বই বা উপন্যাস পড়লে দেখবার কেউ নেই সেখানে গীতা পড়তে পড়তে এসেছে!! আর শুধু তাই নয়, ওর বাবা যিনি আজ তিন-চার বৎসর মারা গেছেন তিনি কবে কি উপদেশ দিয়েছেন তাই সে আজও এমনি ভাবে মেনে চলেছে!!! ভারী খুসী—ভারী খুসী হলেন মনে মনে, মুখে বললেন "বেশ, বেশ, এই সবই তো ছেলেদের পড়া উচিত—আজে-বাজে বই না পড়ে। যাও, তোমার মামীমার কাছে যাও, হাত মুখ ধুয়ে কিছু খাও গে।"

নিশু মনে মনে খুব এক চোট হেসে নিল—ভাবলে, মামাকে কি রকম খুসী করেই না দেওয়া গেছে। গীতা! গীতা তো কত পড়ি! প্রথম পাতাটাই কখনও ওলটাই নি। মামা তো আর কাপড়ের ট্রাঙ্ক খুলে দেখছেন না যে কাপড়-চোপড়ের নীচে কতগুলি ডিটেকটিভ নভেল রয়েছে।

মামার সঙ্গে তো এই রকম চাল চেলে নিশু ভিতরে গেল। তারপর বাকী সকলকেও খুসী করে ফেললে কয়েক মিনিটের মধ্যে শুধু তার মধু মাখা কথা দিয়ে।

নিশুর উপর সকলেই খুসী। তবে মামা সেদিন খুসী হয়েছিলেন বলে যে নিশুর উপর নজর রাখেন নি তা নয়। সে পাত্রই তিনি নন। তবে এপর্যন্ত নিশুর কোন দোষই ধরতে পারেননি। নিশু টুকে পাস করা ছেলে, সে মামার নজরের উপর নজর রাখে। মামা বেড়ান ডালে ডালে, সে তো বেড়ায় পাতায় পাতায়। মামা যতই রবারের জুতো পায়ে হাঁটুন, আর যতই পা টিপে টিপে চলুন, নিশু ঠিক আগে থাকতে জানতে পারে। ওর শ্রবণ-শক্তি হরিণ কিংবা খরগোসের শ্রবণ-শক্তির চেয়েও যেন তীক্ষ্ণ।

দু'চার দিন গেছে। নিশু চলেছে স্নানের ঘরে। যখন দালানের উপর দিয়ে স্নানের ঘরে যাচ্ছে তখন সে পাশের একটা ঘরের দরজার পাশ থেকে নিঃশ্বাসের আওয়াজ পেল। বুঝল, মামাবাবু ওৎ পেতে আছেন। সে স্নানের ঘরের দরজা বন্ধ করলেই অমনি দরজায় কান পাতবেন। একবার ভাবলে, আজ স্নানের ঘরে গিয়ে ভুলেও গানটান করা হবে না। খুব সাবধানে

থাকতে হবে। আবার ভাবলে, না আজ আর এক চাল ছাড়তে হবে। ভেবে যেন নিজের মনে মনেই একটু চেঁচিয়ে বললে (যাতে মামার কানে যায়) "ওঃ যা, দাঁতের মাজনটা আনতে ভুলে গেলাম—" বলে উপরে চলে গেল। উপরে গিয়ে মামীমার পূজার ঘর থেকে স্তবের পাতলা বইটা নিয়ে তোয়ালের ভিতর জড়িয়ে নীচে চলে এল। নীচে এসে কান পেতে শুনল। তখনও দরজার পাশ থেকে নিঃশ্বাসের শব্দ আসছে। ভাবলে মামাবাবু সেই থেকে এখনও পর্যন্ত ওৎ পেতে আছেন। ধৈর্য বটে! স্নানের ঘরে গিয়েই সে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর একটু পরেই বুঝতে পারলে যে মামাবাবুর কান দরজায় ঠেকেছে এইবার। প্রথমে সে একটু গুণ গুণ করে সুর ভাঁজতে লাগল স্নান করতে করতে। মামাবাবু কান খাড়া করে আছেন, ভাবছেন এইবার গান ধরবে নিশ্চয়। কোন্ শাস্তিটা দেবেন ঠিক করতে লাগলেন মনে মনে। ভাবলেন, যাক্ এতদিন পরে ছেলেটা ধরা পড়েছে। হঠাৎ তাঁর কানে এল নিশু কি একটা গাইছে—কিন্তু এ কি। এ যে সুর করে স্তোত্র গাইছে দুর্গার! দুর্গা-স্তোত্র শেষ হয়ে গেল। এবার শিব-স্তোত্র। তারপর সূর্যের স্তোত্র।

মামাবাবু মোহিত হয়ে গেলেন। আহা, এমন ছেলে স্তোত্রের পর স্তোত্র মুখস্থ বলে চলেছে। স্নানের ঘরে বাড়ীর অন্ত ছেলেরা গায় থিয়েটারের গান আর এ গাইছে স্তোত্র। তাঁর দুঃখ হল—এমন ছেলে যদি তাঁর হত। আস্তে আস্তে দরজার কাছ থেকে তিনি সরে গেলেন। নিশু অমনি স্তবের বইটা তোয়ালাতে মুড়ে বার হয়ে পড়ল।

নিশুর উপর দিনের পর দিন উঁচু ধারণা হতে লাগল মামাবাবুর।

আর একদিন বৈকালে বাড়ীর ছোট বড় পাঁচ-সাতজন ছেলেমেয়েকে নিয়ে বসে নিশু খুব গল্প জমিয়েছে। যত সব ওর বাহাদুরীর গল্প—কি করে ধুতির সঙ্গে বইয়ের পাতা এঁটে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষায় ঢুকেছিল। একটা মাত্র অচল দুয়ানি পকেটে নিয়ে কি করে সমানে এক মাস বাসে-ট্রামে ঘুরেছিল। কিংবা কি করে তার ছোট কাকার খাবার জলের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়ে তাকে অঘোর নিদ্রায় নিদ্রিত করে দিয়ে সারারাত থিয়েটার দেখেছিল—এমন কত কি! কিন্তু গল্প যতই করুক চোখ কান তার ঠিক পড়ে আছে সিঁড়ির দিকে। গল্প যখন খুব জমে উঠেছে তখন নিশুর চোখ পড়ল—সিঁড়ির ঘরের জানালার কাঁচের উপর একটা ছায়া পড়েছে। নিশু বুঝল যে মামাবাবু

এসেছেন। একটুখানির জন্য সে চুপ করল। ছেলেদের মধ্যে থেকে একেবারে তিন-চারজন এক সঙ্গে বলে উঠল—"তার পর, তার পর?"

নিশু বুঝল এতক্ষণে মামাবাবু কান পেতে শুনছেন। সে খুব আস্তে বললে, "মামাবাবু এসেছেন চুপ!" বলেই বেশ জোর গলায় বলতে লাগল—যাতে সিঁড়ির ঘর থেকে শোনা যায়—"তার পর? তার পর সেই ভিখারীটাকে রাস্তা থেকে উঠিয়ে একজনের বারান্দায় শোয়ালাম। মা স্কুলে খাবার জন্যে চারটে পয়সা দিয়েছিলেন। সেই পয়সা দিয়ে বরফ কিনে এনে তার মাথায় দিলাম। অনেকক্ষণ পরে সে সুস্থ হলে তাকে আমি আর একটি ছেলে ধরাধরি করে তার বাড়ী পৌঁছে দিলাম—ভিখারীর বুড়ো মা কি আশীর্বাদই করলে আমাদের—।"

সিঁড়ির ঘর থেকে মামাবাবু ভাবলেন—করবে না আশীর্বাদ? এমন দয়ালু পরোপকারী ছেলে—!

এদিকে ছেলেরা কিছুই বুঝছে না গল্পের মাথামুণ্ডু। তবু চুপ করে আছে, কারণ ওদিকে একেবারে বাঘ যে স্বয়ং।

নিশু তারপর আরও রং চড়িয়ে গল্প ধরল—কি করে তার বন্ধু নীতিশ একজন অন্ধ লোককে আগুন-লাগা ঘরের মধ্যে থেকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের একটি চোখ হারিয়েছিল।

মামাবাবু শুনছেন আর আনন্দে গদগদ হয়ে ভাবছে—ধন্যি ছেলে যেমনি নিজে তেমনি সব বন্ধু।

নিশু তখন বলছে—"এমনি করে পরের জন্য প্রাণ দিতে হয়, বুঝলে তোমরা? আমরা বাঁচব শুধু পরের জন্য—এই হওয়া উচিত আমাদের আদর্শ।—"

মামাবাবু এবার একেবারে গলে গেলেন, ভাবলেন এই সব ছেলে বাড়ীতে থাকলে বাকী ছেলেগুলোরও উন্নতি হয়। গল্পচ্ছলে কি সুন্দর উপদেশ দিচ্ছে—কত বড় আদর্শ সম্মুখে ধরছে ছেলেদের! বাঃ বাঃ চমৎকার। আস্তে আস্তে নেমে গেলেন তিনি।

নিশু দেখল ছায়া সরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে একেবারে স্বর বদলে হেসে বললে—"তার পর" বলে আবার সেই আগের গল্প সুরু করল—"ছোট কাকা তো অঘোরে ঘুমুচ্ছেন। আমি কাপড়ে কাপড়ে গিঁট দিয়ে বারান্দায় রেলিং-এর সঙ্গে বেঁধে নেমে পড়লাম—"

ছেলেরা আবার কান খাড়া করে শুনতে লাগল।

নিশুর আর কোনও বিপদ ঘটল না—মামাবাবু তার উপর নজর রাখা বন্ধ করলেন। এমন কি অন্য ছেলেরাও তার সঙ্গে থাকলে অনেক সময় তিনি নিশ্চিন্ত থাকতেন।

রোজ খুব ভোরবেলা উঠে নিশু ছেলে-পিলেদের নিয়ে বেড়াতে যায়। মামার অনুমতি নিয়েছে আগেই। বলেছিল—"বাবা বলতেন প্রাতঃভ্রমণে স্বাস্থ্য ভাল থাকে, মন প্রফুল্ল থাকে। আর ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিও বেড়ে যায়। তা আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে রোজ ভোর বেলা একটু বেড়িয়ে আসি—"

মামাবাবু বলেছিলেন—"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। ঐ ছেলেগুলোকেই তোমার সঙ্গে নিয়ে যেও।"

নিশু ভোরবেলা উঠে ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে, আর গায়ের কাপড়ের মধ্যে একখানি ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস লুকিয়ে নিয়ে বার হয়ে পড়ে। অনেক দূরে মাঠের মধ্যে গিয়ে একটা গাছতলায় বসে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ে। আর সবাই শোনে। একটু বেলা হলে আবার বইখানি লুকিয়ে নিয়ে বাড়ী ফেরে।

নিশুদার অধীনে থেকে এবং পরামর্শে চলে ছেলেদের আজকাল অনেক শাস্তি কমে গেছে। নিশু ওদের কাছে একটা কেষ্ট বিষ্টু গোছের হয়ে উঠেছে।

এমনি ভাবে তো দিন চলছে। একদিন শম্ভু বলে একটি ছেলে এল নিশুর মামার বাড়ী। দু'চার দিন থাকতে থাকতেই বেচারা মরেছে। একদিন সন্ধ্যার পর দু'ঘণ্টা ব্যাঙ। নস্যি নিয়ে ধরা পড়েছিল নাকি। শম্ভুর অবস্থা দেখে নিশুর সেদিন ভারী মায়া হল। সে শম্ভুর কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় বলে গেল—"কাল সকালে ভোরে আমার সঙ্গে বেড়াতে যেও; কি করে মামার হাত থেকে বাঁচতে হয় তা সব শিখিয়ে দেব।"

পরদিন ভোরবেলা। নিশু শম্ভুর ঘরে এসে দেখে শম্ভু তখনও লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছে। সে বলল—"এই শম্ভু, ওঠো, চল, দেরী হয়ে গেল মামাবাবু উঠে পড়বেন—তখন মুস্কিল হবে। শীগ্‌গির ওঠ, আজ একখানা নতুন বই আরম্ভ হবে—রবার্ট ব্লেকের।"

লেপটা একটু নাড়ল—শম্ভু ওঠে না।

নিশু বললে "আরে ভয় কাকে? মামাকে তো? কোনও ভয় নেই।

যতক্ষণ এই নিশু মুখুয্যে আছে ততক্ষণ কোনও ভয় নেই। কত বড় বোম্বেটে ছেলে এই নিশুচন্দ্র তা তো তাঁর জানা নেই।"

লেপটা আরও বেশী করে জড়িয়ে নিল শম্ভু এবার। নিতান্তই কুঁড়ে ছেলেটা।

নিশু এবার লেপটা ধরে টানলে—লেপ কিন্তু শম্ভুর মাথা থেকে বা গা থেকে খুলল না।

নিশু বলল—"মামাকে অত ভয় করবার কিছু নেই যতক্ষণ আমি আছি। প্রথমতঃ গীতার চাল, দ্বিতীয়তঃ স্তোত্রের চালে মামাকে ঘায়েল করেছি। চল না মাঠে, সব বলব। কি করে আগে থাকতে পকেটে গীতা রেখে—কি করে আগে থাকতে মামা লুকিয়ে আছে জেনে স্তবের বই নিয়ে গিয়ে স্নানের ঘরে বই থেকে স্তব পড়ে মামাকে বোকা বানিয়েছি—সব বলব, চল না। এই তো রোজ মাঠে বেড়াতে যাই, মামা জানেন প্রাতঃভ্রমণ করি. অথচ এদিকে একুশখানা ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস যে শেষ হয়ে গেল মামা কি তার খোঁজ রাখেন নাকি?"

লেপটা এবার খুব নড়ছে।

নিশু বললে—"চল, চল, আমাকে ধরে এমন লোক জন্মায়নি। বাবা, কলকাতার টাট্টু মার্কা ছেলে আমি—" নিশুর কথা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। ও যেন ভূত দেখেছে। দরজার পাশে থেকে শম্ভু যে ইশারা করছে। তবে—তবে এ লেপের ভিতর কে?

শম্ভু দরজার কাছ থেকে প্রাণপণে ইশারা করছে—"মা-মা-বা-বু, মা-মা-বা-বু ওই লেপের ভেতর—"

নিশুর মাথাটা এবার ঘুরে গেল—তার পরের মুহূর্তেই এক লাফে বাইরে।

শম্ভু বললে—"কাল রাত বারোটার ট্রেনে মামাবাবুর এক কাকা এসেছেন তাঁকে মামাবাবুর বিছানায় শুতে দিয়ে মামাবাবু আমার বিছানায় এসে শুয়েছেন কাল। আমি নিধুদার কাছে একসঙ্গে শুয়েছিলাম।"

আর শুয়েছিলাম—নিশু ততক্ষণ তার বাক্স বিছানা সব কিছু ফেলে বাড়ী থেকে ছুট—

মামাবাবুও ততক্ষণে উঠে পড়েছেন—তাঁর বজ্রগম্ভীর স্বরে বাড়ী কাঁপতে লাগল—"নিশু, নিশু!"

কিন্তু কোথায় নিশু—সারা বাড়ীময় খুঁজে নিশুকে পাওয়া গেল না।

চাকরটা বলল—"নিশুবাবু ইষ্টিশানের দিকে ছুটলেন দেখলাম—"

মামাবাবুও ছুটলেন স্টেশনের দিকে—রাগে থর থর করে কাঁপছে তাঁর সারা শরীর। উঃ, এত বড় পাজী শয়তান! কি ধাপ্পাটাই দিয়েছে এতদিন। একবার পেলে হয় ওকে। স্টেশনে এসে শুনলেন তখন কোনও ট্রেন নেই। তবে গেল কোথায়? যাই হোক মধুপুরের মধ্যেই আছে, যাবে কোথায়? কিন্তু ও কি! ওই যে মাল গাড়ীটা যাচ্ছে—ওর উপর—হ্যাঁ, নিশুই তো! একটা গাড়ীর কয়লার উপর বসে রয়েছে। সত্যিই নিশু তখন প্রাণের দায়ে চলন্ত মালগাড়ীর উপরে চড়ে বসেছে—বুকটা তখন তার ধড়াস ধড়াস করছে।

মামাবাবু রাগে দুঃখে মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে বাড়ী ফিরলেন। সেদিন নাকি বাড়ীর সকলের দোষে ও বিনাদোষে ব্যাঙ আর চেয়ার হতে হয়েছিল।

আর নিশু?

এরপর নিশুর মধুপুরে যাওয়া দূরে থাকুক কোনও দিন নাকি মধুপুরের ও লাইন দিয়েও কোথাও যায় নি।



চাকরী করা হয়রাণি

বিজনপুর গ্রাম, সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। স্টেশনের পাঁচিলের উপর বসে গ্রামের কতকগুলি কুড়ি-বাইশ বৎসরের যুবক বেশ গল্পের আসর জমিয়েছে। সন্ধ্যার ট্রেনটা এসে পৌছাল। ওরা একবার মাত্র ট্রেনটার দিকে তাকিয়ে আবার যেমন গল্প করছিল তেমনই গল্প করে চলল। একটু পরেই ওদের মধ্যে থেকে একজন চীৎকার ক'রে উঠল—"আরে, নিবারণ যে! কি আশ্চর্য!"

তাদের গল্প হঠাৎ মাঝপথে থেমে গেল। ওরা সবাই এগিয়ে এল ট্রেনটার দিকে। সত্যিই। নিবারণও তখন অনেকটা এগিয়ে এসেছে ট্রেন থেকে নেমে।

বুধবার আজ—তবে নিবারণ এল কি ক'রে? অফিস কামাই করবে নাকি কাল? না রাত চারটের ট্রেনে চলে যাবে আবার কলকাতায়? এল কেন? বিশেষ কোন কাজ—না অসুখ-বিসুখ—?

নিবারণ এতক্ষণে একেবারে ওদের কাছে এসে পড়েছে কিংবা ওরাই নিবারণের কাছে এগিয়ে গেছে; যাই হোক, দুই পক্ষ তখন সামনা-সামনি। এরা কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই নিবারণ ওদের সমস্ত ঔৎসুক্য মিটিয়ে দেবার জন্য বললে—"চাকরী ছেড়ে দিয়ে এলাম রে—"

কথাটা শুনে সকলে প্রথমটায় স্তম্ভিত হয়ে গেল—কেউ কথা বলতে পারল না একটিও। শেষে মনে হ'ল, হয়তো নিবারণ ঠাট্টা করছে। কিন্তু না, ঠাট্টা ত' নয়—নিবারণ ত' বেশ গম্ভীর ভাবেই বলল কথাটা—আর ওর মুখে-চোখে ত' কোথাও ঠাট্টার চিহ্নের লেশ মাত্র নেই! তবে?

উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল সবাই। নিবারণ নিজের ইচ্ছায় চাকরী ছেড়ে দিয়ে এল! ও প্রাণ ছাড়তে পারে কিন্তু চাকরী ছাড়তে পারে না যে! গাঁয়ে ত' ওর খাওয়া পরার অভাব ছিল না খুব—তবুও কলকাতার অফিসে চাকরী করার ওর একটা দুর্দান্ত কামনা চিরকাল। পাকা তিনটী বছর ধরে চেষ্টা করার পর ও যেদিন চাকরী পেল একটা মার্চেণ্ট অফিসে—সে দিন ওর আশে পাশে দাঁড়ান শক্ত হয়ে উঠেছিল অন্য লোকের পক্ষে। স্যুট্ পরে ও যেদিন উঠল ট্রেনে সেদিন ওকে যারা দেখেছিল তারা জীবনে আর কোনও দিন ভুলবে না ওকে। মনে হ'ল—ওই বা কে আর হাইকোর্টের চীফ্ জাষ্টিসই বা কে?

সেই চাকরী ছেড়ে দিয়ে সে চলে এল হঠাৎ!

নিবারণ যেন আর সে নিবারণ নেই, মহা মুষড়ে পড়েছে একেবারে! বললে, 'চাকরী ছাড়লাম বাধ্য হয়ে, মানে, কোন মানুষের সাধ্য নয় অফিসে—বিশেষতঃ মার্চেণ্ট অফিসে চাকরী করা। বলবে, অজস্র লোক ত' করছে। হ্যাঁ, করছে; তবে যারা করছে তারা হয় দেবতা না হয় দৈত্য—

'ভাবতে পারিস্, তোরা, সকালে আটটার সময় রোজ ভাত খেতে বসছিস—এক-আধদিন নয়, রোজ? তারপর সাড়ে আটটার সময় ট্রামে উঠবার জন্য মারামারি! সে ভীড় তোরা কল্পনা করতে পারবি না! অর্ধেক লোক যায় ট্রামের ভিতর, অর্ধেক যায় বাইরে!

'এ দেহটার কথা ছেড়ে দে—এর না হয় কোনও দাম নেই, কিন্তু জামা-কাপড়, জুতো এ সবের দাম আজকালকার দিনে ভাব ত'। সেদিন একটা নতুন জুতো কিনে সেটা পরে অফিসে গেলাম। ফিরলাম যখন তখন দেখি একটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড কিংবা সেকেণ্ড ফুট্‌ও বলতে পারিস্—জুতো পরে বাড়ী এসেছি। চিরকাল লোকেরা জুতো মেরে লোকের চেহারা বিগড়ে দেয় শুনেছি, কিন্তু, দেহ দিয়ে মাড়িয়ে যে জুতোর চেহারা লোকে এ রকম বিগড়ে দিতে পারে তা জানতাম না। একদিন কি হয়েছে জানিস্, দেখি কণ্ডাকটারের সঙ্গে ফুট্‌বোর্ডের কাছে দণ্ডায়মান একটী ছোকরার তুমুল ঝগড়া বেধে

গেছে। কণ্ডাকটার চায় ভাড়া, সে ছোকরাও দেবে না। কণ্ডাক্‌টার বললে—'ভাড়া দিন না মশাই?' লোকটা বললে—'ভাড়া দেব কেন?' কণ্ডাক্‌টার চটে উঠে বললে—'বাঃ, ভাড়া দেবেন না? ট্রামে চড়ে যাচ্ছেন, ট্রামের ভাড়া দেবেন না?' ছোকরাও একটু তেতে গিয়ে বলল—'ট্রামে চড়ে যাচ্ছি মানে? ভাড়া যদি দিতেই হয় তা হ'লে এই ভদ্রলোককে দেব'—বলে সামনের একটা বিপুলাকার ভদ্রলোককে দেখিয়ে দিল।

'সবাই তাকাল তার দিকে, তার এই বিস্ময়কর উক্তিতে। সে বলল, 'বিশ্বাস না হয়, জিজ্ঞাসা কর এই ভদ্রলোককে। কালীঘাট থেকে আসছি ওঁর পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে এবং ওঁরই দেহটিকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ঝুলতে ঝুলতে। তোমার ট্রাম আমি ছুঁয়েছি কোথাও? ভাড়া দিতে হয় ওঁকে দেব।

একটু থেমে নিবারণ বলাল—'এই অবস্থায় যখন অফিসে এসে পৌঁছাই তখন দেখি হয়ত দু'মিনিট দেরী হয়ে গেছে। নামটি আমার রক্ত-চিহ্ন বুকে ধারণ ক'রে হাজির হয়ে গেছে সাহেবের কাছে। বড়বাবুর কাছে তাড়া খেয়ে কাজে বসি—ঘরে ফিরতে কত দিন সন্ধ্যা হয়ে যায়। সবই সহ্য ক'রে কাজ করছিলাম, কিন্তু সেদিন যে ব্যাপার ঘটল তাতে আর কাজ করার সাহস হ'ল না।'

ব্যাপারটা জানবার জন্য সকলেই বেশ একটু চঞ্চল হয়ে উঠল। নিবারণ বলতে লাগল: 'আমাদের অফিসে কাজ করতেন হরিহরবাবু। কি খাটুনিটা খাটতেন ভদ্রলোক! বিশ বৎসর একটানা কাজ ক'রে আসছিলেন এ অফিসে। সেই হরিহরবাবু একদিন অফিসে এলেন, শুনলাম ওঁর শরীরটা খারাপ—সর্দি, কাশি ও তার সঙ্গে একটু জ্বর। ভদ্রলোক সেই রকম শরীর খারাপ নিয়েই দু'দিন অফিস করলেন, তার পর আর পারলেন না—ছুটি নিতে বাধ্য হলেন। একদিন যায় দু'দিন যায়—হরিহরবাবু আসেন না। বুঝলাম, শরীরটা একটু বেশীই খারাপ হয়েছে। ক্রমশঃ বারো দিন কেটে গেল। সেদিনও হরিহরবাবু এলেন না! সাড়ে ন'টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে বড়বাবু, সাহেবের কাছে সইএর খাতা পাঠাবার আগে যে ক'জনের নামসই নেই খাতায় তাদের নাম ধরে, যেমন রোজ একবার ডাকেন সেদিনও তেমনি ডাকছিলেন। হরিহরবাবুর নামের কাছে এসে ডাকলেন—"হরিহর ভট্টাচার্য?" সবাই জানে, আজ বারো দিন হ'ল ভদ্রলোক আসেননি কাজেই ওর নামটা শুধু ডাকার জন্যই

ডাকা। কিন্তু আশ্চর্য! মহা আশ্চর্য! হরিহরবাবুর নামটি ডাকার সঙ্গে সঙ্গে কে যেন ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দিল—"ইয়েস স্যর।"

'সকলে অবাক হয়ে গেল। কেউ কি চালাকি করছে? উঁহু, বড়বাবুর সঙ্গে রসিকতা করার মত দুঃসাহস আমাদের অফিসে কারো ছিল না। বড়বাবু খাতা বন্ধ করতে যাচ্ছিলেন, উত্তর শুনে আর একবার ডাকলেন "হরিহর ভট্টাচার্য?" আবার সেই উত্তর "ইয়েস স্যর।"

'বড়বাবু গুরুগম্ভীর গলায় বললেন—"কে মিথ্যা রসিকতা করছে", উত্তর এল—"রসিকতা নয়, সত্যিই স্যর, আমি এসেছি।"

'বড়বাবু চারিদিকটায় একবার তাকিয়ে নিয়ে বললেন—"এসেছেন ত' কোথায় আপনি?" উত্তর এল—"আজ্ঞে, গাছের উপরে। এই যে বেল গাছে।" সবাই চমকে উঠলাম ভয়ে। বড়বাবুর গলার স্বর নেমে এসেছে ততক্ষণ। তবুও বললেন, "গাছের উপরে কেন?"

'উত্তর এল—"আজ্ঞে, পরশু রাত্রে আমি মারা গেছি স্যর; আমার 'ক্যাজুয়াল্ লীভ' ফুরিয়ে গেল আজ, আর ত' ছুটি পাওনা নেই, তাই ছুটে এসেছি। ভেতরে যাওয়া সম্ভব নয় ব'লে গাছে বসে আছি—দয়া ক'রে আমাকে প্রেজেণ্ট্ মার্ক করবেন—স্যর!"

'সাহস সঞ্চয় ক'রে বড়বাবু বললেন—"মারাই যখন গেছেন তখন ক্যাজুয়াল্ লীভ ফুরিয়ে গেলেই বা?"—উত্তর এল—"আজ্ঞে, ওটা অভ্যাস। ক্যাজুয়াল্ লীভ ফুরিয়ে গেলে আর কামাই করতে পারি কি? মারা গেলেও আসতে হবে বৈকি! দয়া ক'রে প্রেজেণ্ট মার্ক করবেন স্যর!" ক্যাজুয়াল লীভ জানিসত? হঠাৎ দরকারের জন্য প্রতি বছর কেরানীদের যে ছুটি বরাদ্দ থাকে। বেশী নয়, কোন অফিসে পনেরো দিন, কোথাও বা আবার মাত্র বারো দিন। কিন্তু জিনিষটা চাকুরের জীবনে যে কী মূল্যবান সম্পদ তা তারাই জানে।'

একটু থেমে নিবারণ বললে—"আর মুহূর্ত মাত্র নয়। তৎক্ষণাৎ অফিস থেকে বার হয়ে সোজা স্টেশনের দিকে। চাকরীরপায়ে প্রণাম বাবা। আর নয় পথে "

নিবারণ গল্পটা শেষ করতে সকলে চীৎকার ক'রে হেসে উঠল। সমরেশ বলল,—"হাউ বোগাস!"

নিবারণ কিন্তু ওদের হাসিতে ঠিক যোগ দিতে পারল না—হয়ত' খানিকটা সত্য কোথাও ছিল ওর ঐ বোগাস গল্পের মধ্যে।



সাজা বেশী কার ?

শীতের রাত। খাওয়াদাওয়া সেরে তিন চোর গল্প করছে একটা পুরানো ভাঙ্গা বাড়ীর ভাঙ্গা একটা ঘরে বসে। আগুন পোহাচ্ছে আর গল্প করছে। ওদের মাসে একটা রাত চুরির কাজে ছুটি। আজ সেই ছুটির রাত। তিন বন্ধু ওরা—যাকে বলে প্রাণের বন্ধু; বড় চোর, মেজ চোর আর ছোট চোর। সংক্ষেপে ওরা পরস্পরকে ডাকে—'বড়', 'মেজ' আর 'ছোট' বলে।

সেদিনের গল্পের বিষয়টা ছিল, চুরি করতে গিয়ে কে কবে কি রকম ভাবে সবচেয়ে বেশী নাজেহাল হয়েছিল। সুরু করল বড় চোরই প্রথমে।

"বলি শোন্ মেজ আর ছোট! চুরি করতে গিয়ে অনেকবার অনেক রকম বিপদে পড়েছি কিন্তু সেবার যে রকম বিপদে পড়েছিলাম সে রকম বিপদে আর কখনও পড়ি নি। শুনলে হয়তো লোকে হাসবে কিন্তু আমার প্রাণ সে দিন ওষ্ঠাগত হয়ে এসেছিল।

"শীত তখনও পড়ে নি বললেই চলে। ঢুকছি এক গৃহস্থের ঘরে চুরি করতে। ঘরটায় শুয়ে বাড়ীর কর্তা আর গিন্নী। জানালা দরজা সব বন্ধ করে শুয়েছে ওরা। বাইরে থেকে অনেক কসরৎ করে ঘরে ঢোকবার খিলটা খুলে ফেললাম। খুলে ফেললাম বটে কিন্তু খুলতে গিয়ে খট্ করে খিলটায় একটা শব্দ হয়ে গেল। আর যাবে কোথায়? গিন্নীর ঘুম গেল ভেঙ্গে। আস্তে আস্তে ডাকল কর্তাকে—'শুন্‌ছ, ওগো শুন্‌ছ? শীগিগ্‌রি ওঠো, ঘরে চোর ঢুকেছে।'

"কে কার কথা শোনে! কর্তার তখন সজোরে নাক ডাকছে একটা প্রকাণ্ড লেপের তলায়।

"গিন্নী লেপশুদ্ধ কর্তাকে জোরে নাড়া দিয়ে বল্লেন—'ওঠ না! ঘরে চোর ঢুকেছে যে!'

"কর্তা লেপটাকে আরো ভাল করে জড়িয়ে ধরে ঘুম-জড়ানো স্বরে বল্লেন—'ঢুকুক গে!'

"গিন্নী রেগে গিয়ে চাপা গলায় গর্জে উঠলেন—'কী বলছ ঘুমের ঘোরে! শীগ্‌গির উঠে ডাক বাড়ীর সকলকে। চোর পালাবে যে!'

"কর্তা কিছুতেই লেপ ছেড়ে উঠলেন না। গিন্নী তখন ক্ষেপে গিয়ে কর্তার গা থেকে লেপ নিলেন কেড়ে।

"কর্তা বাধ্য হয়ে উঠে বসলেন এবার। উঠে বসেই কাঁপতে লাগলেন। কাঁপতে কাঁপতে বললেন,—'ওরে বাবা রে, কী শীত রে! গেলাম গেলাম—শীগ্‌গির গরম গেঞ্জিটা দাও—'

"গিন্নী খেঁকিয়ে উঠলেন—বললেন, 'মরণ আর কি! শীত আবার কোথায়—?'

"বলতে বলতে উঠে আলনা থেকে গরম গেঞ্জিটা এনে দিলেন।

"আমি এর মধ্যে ঘরের পাশেই একটা ছোট্ট কুঠরি ছিল সেখানে লুকিয়ে পড়েছি। আমার মতলব, কর্তা যেই লোকজন ডাকতে যাবে ঘরের বাইরে গিয়ে, আমিও সেই ফাঁকে কুঠরি থেকে বেরিয়ে চম্পট।

"কুঠরিটা ভাঙ্গা কাঠকাঠরা, বাক্স-পেঁটরা, ছেঁড়া কাপড়চোপড়ে ভর্তি। আমি কোনও রকমে তার মধ্যে দাঁড়িয়ে।

"কর্তা গেঞ্জি পরে আবার বললেন—'কিন্তু শীত গেল না যে! গরম শার্টটা দাও শীগ্‌গির—'

"গিন্নী চাপা গলায় গর্জে উঠলেন—'ঐ কর। ওদিকে চোরটা সরে পড়ল এতক্ষণ—'

"চোরটা যে কোথায় তা ওঁরা কেউ জানেন না। আমি তখন সেই কুঠরির ভেতরে মশার কামড়ে পাগল হয়ে উঠেছি। কী মশা রে বাবা! একটা ভ্‌ঁটো করতে করতে দলে দলে মশা এসে হুল ফোটাতে সুরু করেছে—মুখে, হাতে, পায়ে, গায়ের প্রায় সব জায়গায়। ওদের যেন ভোজ লেগেছে। যন্ত্রণায় ভেতরে ভেতরে ছটফট করলেও বাইরে শব্দ করতে

পারছি না—নড়লে-চড়লে যদি শব্দ হয়। কর্তাটা একবার ঘরের বাইরে গেলে হয়—

"কিন্তু বাইরে যায় কই কর্তা! গিন্নী গজ্ গজ্ করতে করতে গরম শার্টটা আলনা থেকে এনে দিলেন।

"শার্ট গায় দিয়ে কর্তা বললেন আবার—'ওরে বাবা, এতে যে কিচ্ছু শীত গেল না! গরম কোটটা দাও—'

"মনে হ'ল গিন্নী বোধ হয় রাগে আর কথা বলতে পারছেন না। শুধু বললেন 'কোট কোথায় আছে?—'

"কর্তা বললেন—'ঐ তো আলমারীর প্রথম তাকে—ডান দিকে।'

"আলমারী খুলে কোট আনা হ'ল বুঝলাম—

"এদিকে আমার অবস্থা সহ্য-সীমার বাইরে চলে গেছে। সমস্ত গা, হাত, পা, মুখ ফুলে ফুলে উঠেছে—জ্বালা করছে, মনে হচ্ছে যেন সারা শরীরে কে বিষ ঢেলে দিচ্ছে!

"কর্তা কোটটা গায় দিযে খাট থেকে নেমে দরজা পর্যন্ত গিয়েই আবার থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। কাঁদো-কাঁদো স্বরে বললেন—'ওরে বাবা, কী শীত রে বাবা বাইরে! আলোয়ানটা দাও শীগ্‌গির—ঐ ট্রাঙ্কটা থেকে বার করে।'

"গিন্নী দরজা পর্যন্ত তেড়ে এলেন। এবার প্রায় চেঁচিয়েই উঠলেন—'ভীমরতি ধরেছে নাকি? এইটুকু শীতে আর কত চাপাবে গায়ে? চোরটা কোথায় গেল কে জানে। হয়তো বেটা এতক্ষণে পালিয়েছে।

"কর্তা বললেন—'শীতকালে এত রাতে কখনও বাইরে বেরিয়েছি নাকি?'

"চোর পালাবে কি! চোর যে কুঠরির মধ্যে মশার কামড়ে ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছে। মশা তো নয় ভীমরুল! আর পারছিলাম না। ভাবলাম, যা হবার তা হবে, বেরিয়ে পড়ি।

"যাই হোক, আলোয়ানও এল শেষ পর্যন্ত। কর্তা আলোয়ানটা জড়িয়ে এবার ঘরের বাইরে উঠোনে পা বাড়ালেন।

"আমিও এবার কুঠরিটা থেকে আস্তে আস্তে পা বাড়ালাম সরে পড়বার জন্য। উঁহু, হ'ল না। কর্তা আবার ফিরে এলেন যে ঘরে! কাতর স্বরে বললেন—'মাফলারটা দাও, গলায় ভয়ানক ঠাণ্ডা লাগছে—ঠাণ্ডায় গলা ফুলে যাবে যে!' গিন্নী এবার আর কোনও উত্তর দিলেন না—একটু নড়েও বসলেন না।

"অগত্যা কর্তা নিজেই মাফলার আনতে গেলেন। গেলে কি হবে—কোথাও মাফলার খুঁজে পান না। দু' মিনিট গেল, পাঁচ মিনিট গেল, দশ মিনিট যায়।

"মরীয়া হয়ে উঠলাম আমি। যা হওয়ার তা হবে। ডাকলাম—'কর্তা!'

"কর্তা চমকে উঠে বললেন—'কে ?'

"উত্তর দিলাম—'আমি চোর! এই কুঠরির মধ্যে অনেকক্ষণ লুকিয়ে আছি। আপনার পোষা মশার কামড়ে আধমরা হয়ে গেছি। আর পারছি না কর্তা, কোনও রকমে। আপনি মাফলারটা খুঁজে রাখবেন—আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি, গায়ের ফুলোগুলো একটু কমলেই আসব দু'-এক দিনের মধ্যে। সেইদিন যা করবার করবেন। আজ চলি যদি অনুমতি করেন—'

"কর্তা বললেন, 'কথা দিচ্ছিস আসবি তো ঠিক ?'

"হ্যাঁ কর্তা, ঠিক আসব'—বলেই বার হয়ে পড়লাম কুঠরি থেকে এক লাফে। তারপর পাঁচিল টপকে একেবারে বাইরে। শুনতে পেলাম পালিয়ে আসবার সময়, গিন্নী চেঁচাচ্ছেন—'পালাতে দিলে চোরটাকে ?' কর্তা বলছেন, 'কথা দিয়ে গেছে তো আবার আসবে !"

ছোট চোর জিজ্ঞাসা করল, "আবার গিয়েছিলে নাকি, বড় ?"

বড় উত্তর দিল—"নিশ্চয়ই গিয়েছিলাম। আমি চোর, ভদ্রলোক নই তো! কথা রাখব না ? তবে কিছু বলে নি ওরা সেদিন। না বললে কি হবে ? মশার কামড়ের ফুলো সারতে আমার পাকা এক সপ্তাহ লেগেছিল—সেই এক সপ্তাহ কারো সামনে বার হতে পারি নি।"

বড় চোর থামতে সুরু করল মেজ চোর। "আমি জব্দ হয়েছিলাম মশার কামড়ে নয়, জলের কামড়ে।"

বড় চোর ও ছোট চোর প্রায় একসঙ্গেই জিজ্ঞাসা করল,—"সে কি রকম ?"

মেজ চোর বল্লে—"সেও এক দারুণ শীতের রাত। অত শীত বোধ হয় আগে আর কখনও পড়ে নি। শীতের চোটে হাতী কুঁকড়ে শূয়োর হয়ে যাচ্ছে, শূয়োর কুঁকড়ে ইঁদুর হয়ে যাচ্ছে।

"প্রকাণ্ড এক বড়লোকের বাড়ী—লোকজন, দাসদাসী, দরোয়ানে ভর্তি সে বাড়ী। খবর পেলাম কি কারণে অনেক টাকা আনা হয়েছে ব্যাঙ্ক থেকে

বাড়ীতে। ঐ শীতের রাতেও তাই গায়ে দু'টো সোয়েটার চাপিয়ে বার হয়ে পড়লাম। ভাবলাম, যদি কোনও রকম করে টাকাটা হাতাতে পারি তা হ'লে কিছু কালের মত পায়ের উপর পা দিয়ে বসে খাব।

"যে চাকরটা টাকার বখরা পাবার লোভে টাকা আসার খবরটা আমাকে দিয়েছিল সে-ই বাড়ীর বড় সদর দরজাটা রাতের বেলায় আমার জন্যে খুলে রেখেছিল।

"ঢুকে পড়লাম সেই দরজা দিয়ে। চাকরটা আমাকে সব বাৎলে দিয়েছিল কোথা দিয়ে যেতে হবে সেই ঘরে যে ঘরে টাকা আছে। চুপি চুপি আস্তে আস্তে পা ফেলে ফেলে এগুচ্ছি ঘোর অন্ধকারের মাঝে—হঠাৎ পড়লাম সশব্দে হোঁচট খেয়ে পথের মাঝে কে একটা খালি বালতি রেখেছিল তাতেই পা আটকে। সঙ্গে সঙ্গে কুকুরের চীৎকার। উঠে পড়ল দারোয়ান, চাকরবাকর, বাড়ীর সব লোকজন, এমন কি কর্তা পর্যন্ত। চারিদিকে আলো জ্বলে উঠল, উঠে পালাবার আগেই ধরে ফেলল আমাকে বিরাট এক ভোজপুরী দারোয়ান।

"তারপর সুরু হ'ল মার। মারের পর মার। কিল চড় ঘুষি লাথি—ডাণ্ডার ঘাও বাদ গেল না। বাড়ীর বাবুরা থেকে আরম্ভ করে দরোয়ান, চাকরবাকর কেউ বাদ নেই—সমানে পিটিয়ে যাচ্ছে সকলে—থামে না। আমার সমস্ত শরীর ফুলে উঠেছে—মারের চোটে যন্ত্রণায় টন্‌টন্ করছে দেহের প্রতিটি শিরা। নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে—অজ্ঞান হয়ে যাব মনে হচ্ছে। চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে অনেকবার অনেক মার খেয়েছি, কিন্তু এ রকম মার কখনও খাই নি জীবনে।

"মনে হ'ল মৃত্যুর আর বেশী দেরী নেই। যাই হোক, মারতে মারতে ওরাও সকলে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। থামল একটু ওরা।"

"অতি কষ্টে দম নিয়ে বললাম—'এবার আমাকে ছেড়ে দিন বাবুরা! আর মারলে মরে যাব।'

"একজন বাবু চীৎকার করে উঠলেন—'ছেড়ে দেব কি করে! কর্তা মারবেন না?'

"শুনে ভয়ে আঁতকে উঠলাম। এর উপর আবার কর্তা! নতুন হাতে নতুন করে মার! জীবনের সব আশা ছেড়ে দিলাম। তবু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—'আবার কর্তা কেন?'

"এবার আর একজন দাঁত খিঁচিয়ে বললে—'কর্তা মারবেন কেন তা আবার বলতে হবে? বাড়ীর বাবুরা, লোকজন, দারোয়ান, চাকরবাকর সকলে মারল আর কর্তা মারবেন না? কর্তা না মারলে, তিনি বাড়ীর সকলের বড়—তাঁর মানের হানি হবে না?'

"কর্তার মারের অপেক্ষায় আধমরা অবস্থায় সকলের মাঝে খোলা উঠোনে পড়ে রইলাম। একটু পরে উপরের জানালা দিয়ে কর্তা মুখ বাড়িয়ে বললেন 'এই, ঐ চোরটার নোংরা কাপড়চোপড়গুলো খুলে ওকে একটা গামছা পরিয়ে দে তোরা।'

"সর্বনাশ—এ যে মারের চেয়েও বাড়া! যাই হোক, কর্তার আদেশ মত জামাকাপড় খুলে নিয়ে আমাকে গামছা পরানো হ'ল একটা। সেই হাড়-কাঁপানো শীতে খালি গায়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলাম। জানি না, আজ বেঁচে বাড়ী ফিরব কি না!

"কর্তার মুখ আবার জানালায় দেখা গেল। তিনি আবার বললেন,—'বেটার গায়ে বেশ কয়েক বালতি জল ঢাল—নইলে ওকে ছোঁব কি করে?'

"আর শুনতে পারলাম না। ঠাণ্ডা চৌবাচ্চার জল বালতি বালতি ঢালা হ'তে লাগল আমার উপর। প্রায় জ্ঞান হারালাম আমি। সেই অবস্থায় পড়ে আছি—সিঁড়িতে কর্তার খড়মের শব্দ কানে এল। কর্তা নেমে এসে কাছে দাঁড়ালেন। একটু চোখ মেলে দেখলাম—মোটাসোটা চেহারা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, গায় মোটা বালাপোষ—

"কর্তা পাশের একটা লোককে বললেন—'একটু গঙ্গাজল এনে এটার গায়ে ছিটিয়ে দিয়ে শুদ্ধ করে দে—'

"গঙ্গাজল আনতে গেল। কাঁপতে লাগলাম আমি শুধু গায়ে জলে-ভেজা দেহে।

"গঙ্গাজল এল, ছেটানোও হ'ল। ভাবলাম, এইবার বোধ হয় কর্তা বলবেন তাঁর চাবুকটা নিয়ে আসতে। তখন আমি মরীয়া—চোখ বুঁজে চাবুকের অপেক্ষা করছি। কিন্তু কই, চাবুক তো পড়ল না আমার দেহে! কর্তা খালি আমার ডান কানটা ধরে একটু মন্ত্র দিয়ে বললেন তাঁর লোকদের—'মেরেছি বেটাকে খুব, দে বার করে ওটাকে—' বলে, মাথায় গায়ে হাতে একটু গঙ্গাজলের ছিটে দিয়ে, খড়ম খট্‌খট্‌ করতে করতে উপরে উঠে গেলেন তিনি।

"আমার তখন নড়বার অবস্থা নেই। ওরা ধরাধরি করে টেনে আমাকে বাইরের বাগানে ফেলে দিল। প্রায় সারারাত অজ্ঞান অবস্থায় সেইখানে পড়ে থাকে ভোর বেলা কোনও রকমে উঠে টলতে টলতে বাড়ী গেলাম। এরপর জ্বরে শয্যাশায়ী হয়ে রইলাম পাক্কা সাতটি দিন।"

মেজ চোর থামতে ছোট চোর বললে—"আমার না মশার কামড়, না জলের কামড়—আমার ভাগ্যে জুটেছিল গীতার কামড়।"

ওরা জিজ্ঞাসা করলে—"কি রকম?"

ছোট চোর বললে—"বড়লোকের বাড়ীটাড়ী নয়—সাধারণ একতলা এক মাটির বাড়ী। কোন বড় দাঁও মারতেও না। সামান্য কিছু চুরির জন্য সিঁধ কেটে ঢুকেছি ঘরে।

"শীতের রাত নয় সেটা—দারুণ গরম সে রাতে। বৈশাখ মাসটাস হবে। বাইরে থেকে জানালার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে ঘরটা অন্ধকারই বোধ হ'ল—ভাবলাম নিশ্চয় ঘুমোচ্ছে সবাই কিন্তু ভুল হ'ল আমার। ঘরে ঢুকে দেখি, ঘরের কোণে একটা প্রদীপের অল্প আলোয় গলায় পৈতে একটা লোক কি পড়ছে। আমাকে দেখে বইটা রেখে তড়াক্ করে এক লাফ মেরে উঠে এসে আমার একটা হাত চেপে ধরে সিঁধকাঠিটা কেড়ে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তার পরে আমার হাত দু'টোকে পিছনে মুড়ে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে ঘরের ভিতরে একটা বাঁশের সঙ্গে দিল সজোরে বেঁধে—কাছে একটা দড়ি পড়ে ছিল সেইটে দিয়ে।"

বড় চোর আর মেজ চোর বললে—"তুই বাঁধতে দিলি কেন। জোর করে পালিয়ে আসতে পারলি না? একা তো ছিল সে লোকটা।"

ছোট চোর বললে—"ওরে বাবা! সে একাই একশ'। কী তাগড়াই চেহারা তার! আমাদের এই তিনজনকে একসঙ্গে একাই মেরে শুইয়ে দিতে পারে!"

"যাই হোক হাত দু'টো কষে বাঁধল। বেঁধে বলল, 'তুই চুরি করতে এসেছিস? ছিঃ, তুই চোর! দাঁড়া তোকে আজ এমন শিক্ষা দেব যে আর কখনও তুই চুরি করবি না। চুরির সাধই হবে না তোর কখনও।' বলে লোকটা পাশের ঘরে চলে গেল।

"ভাবলাম, নিশ্চয় কোনও লাঠি-টাঠি আনতে গেল। এনে বোধ হয় হাত-বাঁধা অবস্থায় বেধড়ক প্রহার দেবে—এমন প্রহার দেবে যে ভবিষ্যতে চুরির সাধ ছুটিয়ে দেবে। মারের ভয়ে কাঁপতে লাগলাম।

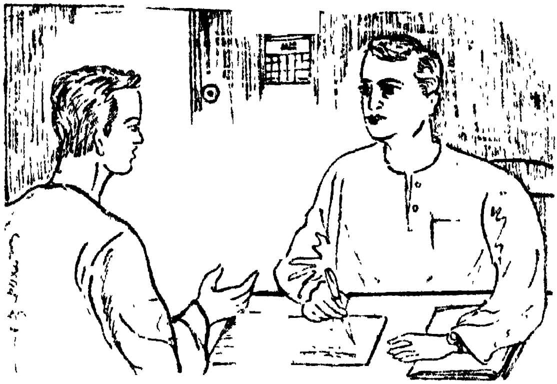
"একটু পরেই কিন্তু লোকটা ফিরে এল। লাঠি-টাঠি কিছু নেই হাতে, আছে শুধু একটা ছোট বই।

"লোকটা বললে, 'আজ তোর মুক্তি হয়ে যাবে যত পাপ করেছিস তার থেকে। একশ' আট বার তোকে গীতা পাঠ করে শোনাব। শুনলে তোর পাপমুক্তি তো হবেই, ভবিষ্যতে আর চুরির ইচ্ছা হবে না।'

"এই না বলে আমার সামনে বসে সেই ছোট বইটা খুলে পড়তে শুরু করে দিল। সংস্কৃত পড়ে, বাংলা করে বুঝিয়ে দেয়। একবার, দু'বার, তিনবার, দশবার, কুড়িবার চলল সমানে পড়া আর তার মানে করা। বোঝ, প্রথম ভাগ সেরে যে আমি দ্বিতীয় ভাগে পৌঁছতে পারি নি, তাকে হাত বেঁধে সারা রাত গীতা শোনানো! একে গীতার শ্লোক চোরের সামনে, তার উপর সেই একঘেয়ে একটানা সুরে। পাগল হয়ে উঠবার যোগাড়। মাথাটা কি রকম করতে লাগল। বললাম, 'ঠাকুর! এর চেয়ে আমাকে বেশ কয়েক ঘা দিয়ে ছেড়ে দাও, সে আমার পক্ষে অনেক ভাল।' শুনলে না ঠাকুর।—'আরে, মেরে কি কখনও চোর শায়েস্তা হয়? সদুপদেশ—গীতা শুনিয়ে তোর মুক্তির উপায় করে দিচ্ছি।'

"কোনও কথায় কান দিলে না, পড়েই চলল। ঘুমে আমার চোখঁ ঢুলে আসছে, মাথা ঝুলে পড়ছে। ঠাকুর উঠে প্রদীপের তেল দু'আঙুলে নিয়ে আমার দুই চোখে রগড়ে দিতে লাগল। ঘুম ছুটে গেল তেলের জ্বালায়। সারারাত ধরে চলল সেই গীতাপাঠ। আমার বাইরে জ্ঞানটা জাগিয়ে রাখলেও ভেতরটা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। কানের ভেতর দিয়ে একটানা শব্দ যাচ্ছিল শুধু আর চোখ দুটো তাকানো থাকলেও মরা মানুষের চোখের মতই সেগুলো দৃষ্টিহীন। যখন ভোর হয়ে উঠেছে, চারিদিকে কাক ডাকতে আরম্ভ করেছে, তখন ঠাকুরের একশ' আট বার গীতাপাঠ শেষ হ'ল। এবার আমার হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে বললে ঠাকুর, 'যা বেটা, তোর সব পাপ কেটে গেল, আর চুরি করিস নে কখনও।"

গল্প শেষ হ'ল, সকলেই এবার এক মত—সাজাটা ছোট চোরেরই বেশী হয়েছিল। তোমরা কি বল?



সমস্যার সমাধান

সেদিন মঙ্গলবার। হরিবাবু রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটার সময় বাড়ী ফিরলেন অফিস থেকে যেমন অন্যান্য দিন ফেরেন ; তবে অন্যান্য দিন এ সময় তাঁর দেহ থাকে ক্লান্তিতে ভ'রে আজ কিন্তু তাঁর মুখে কি যেন একটা চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছে।

হরিহরবাবু হাত মুখ ধুয়ে খেতে বসলেন। কিন্তু কি একটা ভাবনায় তাঁর ভাল ক'রে খাওয়াই হল না। তাঁর মা জিজ্ঞাসা করলেন—"কি রে হরি কিছুই খেলি নে যে ? রান্না খারাপ হয়েছে বুঝি ?"

—"না মা, রান্না খারাপ হয় নি ত', রান্না ত' বেশ ভালই হয়েছে।" —বলে হরিবাবু উঠে পড়লেন। আঁচিয়ে নিয়ে অন্য দিনের মত তখনি বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন তিনি। অন্যদিন বিছানার সঙ্গে তাঁর পিঠ ঠেকাতে না ঠেকাতে তিনি ঘুমিয়ে পাথর হয়ে যান। আজ কিন্তু বিছানায় শোয়ার পর প্রায় ঘণ্টা-খানেক পর্যন্ত তিনি এপাশ ওপাশ করতে লাগলেন। এপাশ ফিরে কি একটা ভাবেন খানিকক্ষণ তারপর ওপাশ ফেরেন ; ওপাশ ফিরে আবার কি ভাবেন খানিকক্ষণ, আবার এপাশ ফেরেন।

তাঁর এই ভাব দেখে তাঁর বিধবা বোন বিজলী আস্তে আস্তে তাঁর কাছে গিয়ে বসে জিজ্ঞাসা করলেন—"দাদা, তোমার কি কোনও রকম শরীর খারাপ বোধ হ'চ্ছে ?"

হরিহরবাবু শুধু বললেন—"না",—বলেই আবার তাঁর বোনের দিকে পিছন ক'রে পাশ ফিরে শুলেন।

বিজলী আস্তে আস্তে উঠে গেলেন একটু বেশ চিন্তিত ভাবেই। তাঁর দাদাকে বিছানায় শোয়ার পর এরকম জেগে কাটাতে ত তিনি কোনও দিন দেখেন নি। অসুখও ত' করেনি কোনও রকম—তবে ?

যাই হোক, হরিহরবাবু খানিকক্ষণ পরে ঘুমিয়ে পড়লেন অবশ্য সেদিনকার মত। পরদিন সকালে উঠে, তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে আফিস চলে গেলেন। তখনও, কিন্তু তাঁর মুখে একটা চিন্তার ছাপ লেগে রয়েছে।

অফিস গিয়েও কিন্তু তাঁর সে ভাব কাটল না। কাজ করতে করতে মনটা তাঁর মাঝে মাঝেই চঞ্চল হয়ে উঠেছে। অফিসের লোকেরাও একটু বেশ আশ্চর্য হ'ল বৈকি আজ। হরিহরবাবুর এক মনে কাজ করাটা অফিসে একটা গল্প-কথা হয়ে উঠেছে। আজ সেই হরিবাবুই কাজ করতে করতে কতবার যে উঠে গিয়ে জানালার কাছে দাঁড়িয়েছেন তা'র ঠিক নেই। একজন ত' একটু চিন্তিতভাবে জিজ্ঞাসাই ক'রে ফেললেন—"হরিবাবু, আপনার বাড়ীতে কি কিছু—?"

হরিবাবু বাধা দিয়ে বললেন,—"না,না, কিছু হয়নি,"—ব'লেই আবার কাজ করতে সুরু করলেন।

আজ যখন বাড়ী ফিরলেন হরিহরবাবু তখন তাঁর মনের মাঝে যেন কালকের চেয়েও আরো বেশী অস্বস্তি বিরাজ করছে মনে হ'ল। কাল খেতে বসে তবু কিছু খেয়েছিলেন, আজ আর কিছু খেতেই পারলেন না। খেয়ে উঠে আজ চিরদিনের অভ্যাসমত বিছানাতে গিয়েও শুলেন না; ছাদে গিয়ে পায়চারী করতে লাগলেন।

হরিহরবাবু যখন ছাদে গিয়ে অস্থিরভাবে পায়চারী করছিলেন, তখন নীচে তাঁর মা, বোন, ছোট ভাই, সকলের মধ্যে মহা এক আলোচনা চলেছে তাঁর এই মানসিক চাঞ্চল্যের বিষয় নিয়ে। এঁদের সকলেরই দৃঢ় ধারণা যে তাঁর অফিসে নিশ্চয়ই একটা কিছু মারাত্মক রকমের গণ্ডগোল হয়েছে।

পরদিন; অফিসে গিয়ে হরিবাবু স্থির হয়ে কাজ করতে পারলেন না কিছুতেই। এমন কি, বড়বাবু হরিবাবুকে ডেকে একটু ঠাট্টা করেই বললেন—"হরিবাবু, আপনার এই হিসাবটার এইখানে যে একটু ভুল করেছেন, দেখছি! আজ পনেরো বছরের মধ্যে এ রকম সামান্য ভুলও ত' কখনও হয় নি! আজ যে চাঁদে কলঙ্ক হয়ে গেল; ব্যাপার কি হরিবাবু?"

হরিহরবাবু মহা লজ্জিত হয়েই ফিরে এলেন বড়বাবুর ঘর থেকে। সেদিন

যখন বাড়ী ফিরলেন তখন তাঁর মুখচোখের অবস্থা দেখে তাঁর মা একরকম কেঁদেই ফেললেন। হরিবাবুকে কোনও কথা বলতে তাঁর আর সাহস হ'ল না। তাঁর মেজ ছেলে বিশ্বেশ্বরকে ডেকে বললেন, "বাবা বিশু, তোর দাদার কি হ'ল—কিছুই যে বুঝতে পারছি নে! তোর কাকাবাবুকে কি একবার আসতে লিখে দিবি? যা ভাল হয় কর বাবা!" বলতে বলতে তাঁর চোখে জল এসে গেল।

খানিক পরে হরিবাবু নিজেই তাঁর মার কাছে এলেন। তিন দিনের মধ্যে এই প্রথম তিনি নিজে থেকে কথা বললেন। তাঁর মার কাছে বসে জিজ্ঞাসা করলেন, "মা, তোমার বিপিনকে মনে আছে?"

তাঁর মা ঠিক বুঝতে পারলেন না—জিজ্ঞাসা করলেন,—"কোন বিপিন, বাবা?"

হরিবাবু বললেন, "আমার বন্ধু সুবোধের খুড়তুতো ভাই বিপিন। সুবোধের সঙ্গে এসেছে কতদিন আমাদের এখানে—তাস খেলতে। তোমাকে এসে একদিন প্রণাম করল।"

হরিবাবুর মা বললেন,—"ঠিক মনে করতে পারছি নে ত' বাবা। নামটা যেন একটু একটু মনে পড়ছে, কিন্তু, তা'র চেহারাটা ত একেবারেই মনে আসছে না!"

হরিবাবু আস্তে আস্তে উঠে গেলেন সেখান থেকে। তাঁর ঘরে যাওয়ার পথে বারান্দায় দেখা হ'ল তাঁর বোনের সঙ্গে। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বিজু, বিপিনকে জানিস্ ত'?"

বিজলী একটু আশ্চর্য হয়েই জিজ্ঞাসা করলেন, "কোন বিপিন, দাদা?"

হরিবাবু বললেন, "সুবোধের খুড়তুতো ভাই—"

বিজলী ওর কথায় বাধা দিয়ে বললেন,—"ও, সেই বিপিনবাবু—তুমি একদিন যাকে চা ক'রে দিতে বললে আমাকে?"

হরিবাবু বলছেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই বিপিন, তাকে দেখেছিস তুই কোনও দিন বিজলী প্রথমে অবাক হ'য়ে গেলেন তাঁর দাদার কথা শুনে। বললেন, "তাঁকে দেখব কি ক'রে। আমি কি তোমার কোনও বন্ধুর সামনে বার হই?"

হরিবাবু হতাশ হয়ে চলে গেলেন।

একটু পরে তিনি বিশ্বেশ্বরকে ডেকে পাঠালেন তাঁর ঘরে। বিশ্বেশ্বর গিয়ে দেখল যে হরিবাবু তাঁর ঘরে অতি অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন, দৃষ্টি

তাঁর মাঠের দিকে নিবদ্ধ। আস্তে আস্তে সে বলল, "আমাকে ডেকেছ, দাদা ?"

হরিবাবু মুখ তুলে বললেন, "হ্যাঁ, শোন—তুই বিপিনকে দেখেছিস্ ?" বিশ্বেশ্বর প্রথমটা তার মার এবং দিদির মতই মুস্কিলে পড়ল—তার দাদা কোন্ বিপিনের কথা জিজ্ঞাসা করছেন বুঝতে না পেরে। অবশেষে তার দাদা যখন তাকে বুঝিয়ে বললেন যে বিপিনকে, তখন সে বললে শুধু—"কি জানি দাদা! তোমার কত বন্ধুই ত' রবিবারে আসেন, আমি অত লক্ষ্য করি নি। আর তাছাড়া, আমি ত' বেশীর ভাগ রবিবারে বালীগঞ্জে মাসীমার বাড়ীতেই কাটাই।"

হরিবাবু নিরাশভাবেই বললেন, "আচ্ছা, যা, খোকাকে একবার পাঠিয়ে দিস।"—ব'লে আবার তেমনি অস্থিরভাবেই পায়চারী করতে লাগলেন।

বিশ্বেশ্বর চলে গেলে একটু পরেই প্রবেশ করল হরিবাবুর ছোট ভাই খোকা —বয়স বোধ হয় নয় কি দশ হবে। খোকা ঘরে ঢুকতেই হরিবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "খোকা, বিপিনবাবুকে দেখেছিস ত' ? সেই সেদিন—তোকে যিনি কাছে ডাকলেন—"

খোকা তাঁর কথায় বাধা দিয়ে বললে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই খুব মোটা—"

হরিবাবু একটু বিরক্ত হয়েই বললেন,—"দূর, সে ত' দিব্যেন্দু, সেই রোগা মত—"

খোকা এবার খুব আশান্বিত হয়ে বললে, "ওহো, বুঝতে পেরেছি, খুব রোগা, মাথায় টাক ত' ?"

হরিবাবু এবার বেশ একটু বিরক্ত হয়েই বললেন, "না, সে নয়—সে যতীন।"

খোকা এবার একেবারে যেন অকূল সাগরে পড়ে গেল, বোকার মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে বলল—"তবে কে ?"

হরিবাবু কষে এক ধমক দিয়ে বললেন,—কেউ নয়, বেরো এখান থেকে।"

হরিহরবাবুর অস্থিরতা ক্রমশঃই বাড়তে লাগল। তাঁর মা তাঁকে অনেক বলে কয়ে একটু শোয়ালেন।... শুলে কি হবে ? একটু পরেই আবার উঠে বসলেন। মাথায় হাত দিয়ে বসে অনেকক্ষণ কি ভাবলেন, তারপর আবার শুয়ে পড়লেন। এমনি করতে করতে রাত প্রায় বারোটা বাজল। খোকা

বহুক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে কাঁদতে কাঁদতে। তার বড়দা'র কাছে কোনও দিন যে সে একটুও তাড়া খায়নি। বিশ্বেশ্বরও ঘুমিয়েছে। বিজলী তাঁর দাদাকে খানিকক্ষণ চুপ করে শুয়ে থাকতে দেখে একটু আগে শুতে গেছেন। কেবল হরিবাবুর মায়ের চোখে ঘুম নেই। তাঁর আর হরির ঘর পাশাপাশি; মাঝখানের দরজাটা খোলা রয়েছে।

রাত্রি তখন একটা ; হরিবাবু যেন উন্মাদ হয়ে উঠলেন—একবার ওঠেন, একবার বসেন, একবার পায়চারী করেন, আবার হয়তো শুয়ে পড়েন।

হরিবাবুর মা কি করবেন ভেবে পান না।

হরিবাবু গিয়ে হঠাৎ তাঁর মাকে বললেন, "মা, দশটা টাকা দাও ত'। হরিবাবুর সমস্ত টাকাকড়ি তাঁর মার কাছেই থাকত।

তাঁর মা অত্যন্ত ভয় পান—টাকা বার করতে করতে বললেন, "টাকা কি হবে, বাবা ?" হরিবাবু শুধু বললেন, "দাও ত', দরকাব আছে।"

তাঁর মা দশটা টাকা হরিবাবুর হাতে দিয়ে বললেন,—"বিশুকে একবার ডাকব ?" তাঁর কণ্ঠস্বরে ব্যাকুলতা ভরা।

হরিবাবু বললেন, "না না, বিশুকে ডাকতে হবে না।" বলেই একটা জামা গায়ে দিয়ে নিয়েই ব্যস্তভাবে রাস্তায় বার হ'য়ে পড়লেন।

হরিবাবুর মা জানালা দিয়ে আকুলভাবে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি দেখলেন, রাস্তা দিয়ে একখানা ট্যাক্সি যাচ্ছিল, সেটাকে থামিয়ে হরিহর তা'তে উঠে পড়লেন। তারপরেই ট্যাক্সি ছুটল বিদ্যুৎবেগে।

হরিবাবুর মা বিশ্বেশ্বর ও বিজলীকে ডেকে বললেন। মায়ের মুখে সব কথা শুনে ওরাও মহা চিন্তিত হয়ে পড়ল। তাদের দাদাকে তারা কখনও ত' এ রকল চঞ্চল হ'তে দেখে নি! আজ ত' তিনি প্রায় উন্মাদই হ'য়ে উঠেছেন। ......বিপিনবাবুর কথা তিনি সকলকেই জিজ্ঞাসা করেছেন একে একে। এই বিপিনবাবুকে নিয়েই নিশ্চয় ঘটেছে একটা সাংঘাতিক কাণ্ড। ওদের মহা দুশ্চিন্তায় সময় কাটতে লাগল।

......এত রাত্রে হঠাৎ ট্যাক্সি করে বার হ'য়ে গেলেন পাগলের মত! কোনও খুন-খারাপি কিছু হবে না ত' ?

ওদিকে হরিবাবু ট্যাক্সিওয়ালাকে বললেন "বরানগর।"

ট্যাক্সি রসা রোড দিয়ে চলল নক্ষত্রবেগে। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে ট্যাক্সি এসে থামল স্থবোধবাবুদের বাড়ীর সামনে।

সমস্ত পাড়া নিঝুম নিস্তব্ধ। হরিবাবু ট্যাক্সি থেকে নেমে সজোরে দরজায় কড়া নাড়লেন। সুবোধবাবুর বুড়ো বাপ নীচের একটি ঘরেই শুতেন। তিনি কড়া নাড়ার শব্দে জেগে উঠে তাড়াতাড়ি গেলেন প্রথমটায়। তারপর একটু ধাতস্থ হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"এত রাত্রে যে বাবা, কি দরকার? সুবোধকে ডাকব?

হরিহরবাবু শুধু বললেন—"না, সুবোধকে দরকার নেই, বিপিনকে যদি একটু কষ্ট করে ডেকে দেন।" সুবোধবাবুর বাবা বললেন,—"বস, বাবা! আমি ডেকে দিচ্ছি বিপিনকে।"

হরিহরবাবু বললেন,—"বসবার দরকার নেই, আপনি শুধু একবার বিপিনকে ডেকে দিন।"

সুবোধবাবুর বাবা চলে গেলেন ডাকতে বিপিনবাবুকে। একটু পরেই বিপিনবাবু নেমে এলেন। বিপিনবাবু এসে হরিবাবুর চেহারা দেখে একেবারে চমকে উঠলেন। চোখ দুটো তাঁর লাল টক্ টক্ করছে, তিন দিন না ঘুমিয়ে চুলগুলি উস্কো-খুস্কো। অত্যন্ত অভিভূতভাবেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "এত রাত্রে কি খবর, হরিদা?"

হরিবাবু বিপিনের মুখের দিকে অল্প খানিকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বললেন, "হয়ে গেছে,—আচ্ছা।" বলেই ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠলেন। ট্যাক্সি আবার ছুটল কলকাতার দিকে।

বিপিনবাবু কিছু বুঝতে না পেরে বিস্মিত হ'য়ে তাকিয়ে রইলেন সেইদিকে খানিকক্ষণ।

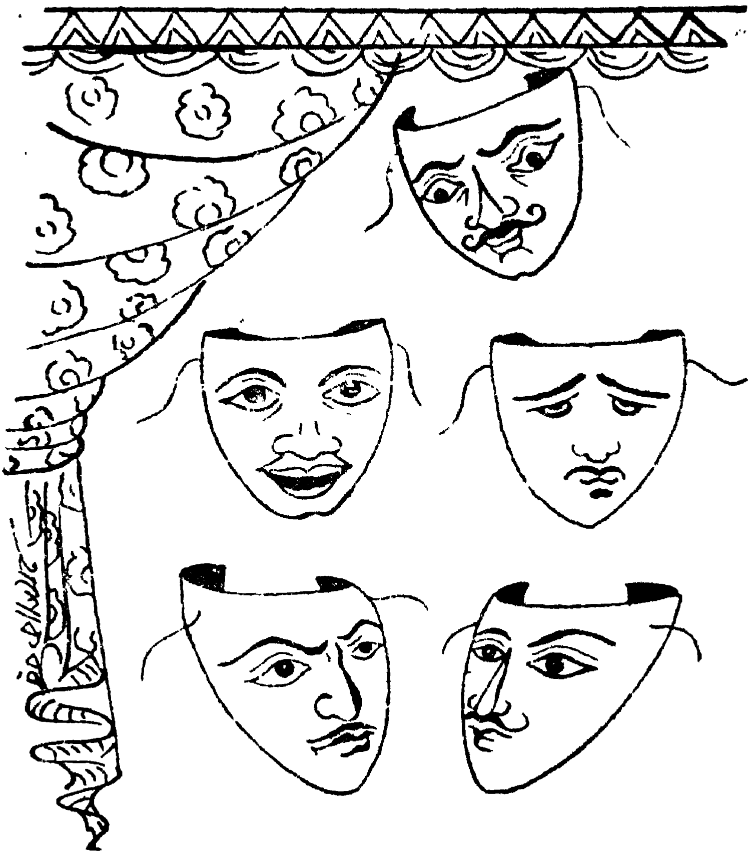
ঘণ্টাখানেক বাদে হরিবাবু বাড়ী ফিরে এলেন। রাত তখন প্রায় তিনটে। হরিবাবুর মা, বোন, ভাই সকলেই দেখলেন যে হরিবাবুর মুখ থেকে সে দুশ্চিন্তার রেখা একেবারে মুছে গেছে—সে জায়গায় একটা পরম শান্তি বিরাজ করছে।

জামাটি খুলেই তিনি বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

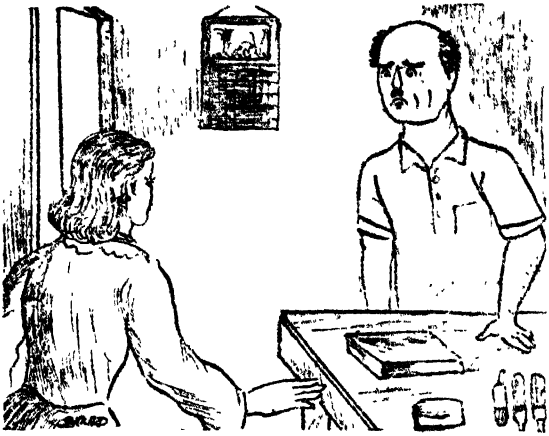
তাঁর মা জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হ'ল বাবা? কোথায় গিয়েছিলি?"

হরিহরবাবুর চোখে তখন সারারাজ্যের ঘুম নেমেছে। তিনি চোখ বুজেই একটু মিষ্টি হেসে উত্তর দিলেন অতি জড়িতভাবেই—"জান, মা, বিপিনের গোঁফ আছে। আমার এক মহাসমস্যা বেধেছিল—" বলতে বলতে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন, কথা আর শেষ হ'ল না।

বিপিনের গোঁফ আছে কি নেই—এই যে মহাসমস্যা হরিহরবাবুর জীবনে বেধেছিল তার অবশ্য সমাধান হ'ল, কিন্তু আমার জীবনের সমস্যার এখনও সমাধান হয় নি। পাটনায় আমার যে মেজমামা থাকেন তাঁর গোঁফ আছে কি না তা আমি আজ পর্যন্ত ঠিক করতে পারি নি। আমারও দিন বড় অস্বস্তিতে কাটছে।



নাটক



নিবারণচন্দ্রের ডাক্তারী

একটা ছোট সহরের একটা সরু গলির উপর একটা ছোট পুরানো একতলা বাড়ী, সামনে একটা ছোট বাইরের ঘর, একটা ভাঙ্গা টেবিল, তার উপরে কয়েকটা জল ভরা বোতল একটা দাগ পড়া পুরানো হোমিওপ্যাথি ওষুধের বাক্স। ঘরের একটা কোণে তামাক সাজার সাজ-সরঞ্জাম।

ঘরের বাইরে দরজাটার পাশে দেওয়ালের গায় একটা কাঠের 'নেম-প্লেট' টাঙ্গানো, তাতে লেখা—"ডাক্তার নিবারণচন্দ্র চক্রবর্তী—শিশু চিকিৎসক" টেবিলের সামনে একটা ভাঙ্গা চেয়ারে খালি গায়ে ছোট একটা কাপড় পরে' বসে আছেন ডাক্তার নিবারণচন্দ্র। গায়ের রং কালো, মাথায় টাক। রাস্তার দিকে তাকিয়ে বসে আছেন ডাক্তার যেন কার বা কাদের প্রত্যাশায়।

(বাড়ীর ভিতর থেকে ডাক্তার গিন্নী রক্তচক্ষু নিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। পরনে একটা আধ-ময়লা ছেঁড়া শাড়ী—)।

ডাক্তার গিন্নী—(সরোষে) কী গো, ডাক্তার সাহেব, আর কতকাল চল্‌বে এমন করে রোগীর আশায় বসে বসে। এদিকে আজ যে উনুনে হাঁড়ি চড়বে না। তার খেয়াল আছে? ঘটি বাটী সব ত বিক্রী হয়ে গেছে, পাড়ার লোকেও আর ধার দিচ্ছে না। নিজে আর ছেলে-মেয়েগুলো গিলবে কী?

ডাক্তার—(কাঁচুমাচু মুখে) গিন্নী কী করি বল? হীরু ধোপা আর পাচু নাপিত তাদের ছেলেমেয়ের জন্ত ওষুধ নিয়ে এই চার আনা, চার আনা, আট আনা দিয়ে গেল। এই দিয়ে আজ কোনও রকমে—

ডাক্তার গিন্নী—ঐ আট আনায় চাল ডাল তেল নুন সব হয়ে যাবে? দেখ, তোমাকে একশ'বার বলেছি ঐ পোড়াকপালে ডাক্তারী ছেড়ে একটা ধার ধোর করে' ছোট খাটো দোকান করো তাতে দুবেলা দু মুঠো ভাত জুটবে তবু।—

ডাক্তার—(আহতস্বরে) গিন্নী আমি একজন ডাক্তার, কতদিনের ডাক্তার, আমি করব পান-সিগারেট কি মুড়ি-মুড়কির দোকান!

ডাক্তার গিন্নী—(হাত দুটো সামনে নেড়ে) ওরে আমার ডাক্তার রে! কোনদিন কোনও ইস্কুলে কলেজে পড়লেন না, কোনও ডাক্তারী পরীক্ষায় পাশ করলেন না, বাড়ীতে বসে' দুখানা হোমিওপ্যাথি বই পড়ে আর কটা ওষুধ নাড়া চাড়া করেই উনি হয়ে গেলেন ডাক্তার। হীরু ধোপা, পাঁচু নাপিত, কালো মুদি এই সব দু আনা চার আনা ভিজিটের রোগী হোলো ওঁর সম্বল—

ডাক্তার—পাশ করাটাই সব নয় বুঝলে? এই যে রবিঠাকুর! কোন পরীক্ষায় পাশ করেছিলেন কখন? অথচ-অথচ অত বড় কবি পৃথিবীতে ক'জন জন্মেছে? (সোজা হয়ে বসে)—ও সব হচ্ছে, প্রতিভার ব্যাপার। প্রতিভা বুঝতে একটু দেরী লাগে লোকের—তবে যখন বোঝে সে প্রতিভা তখন প্রতিভাকে আটকায় কে?

ডাক্তার গিন্নী—(ক্ষিপ্তস্বরে) আরে ধ্যেৎ তেরি প্রতিভা! আমি বলে দিচ্ছি, আর এক সপ্তাহ অপেক্ষা করব। এর মধ্যে যদি তুমি পয়সা রোজগারের অন্য কোনও বন্দোবস্ত না কর তা হলে আমি ছেলেমেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ী চলে যাব—তুমি একা বসে বসে তোমার প্রতিভা ধুয়ে ধুয়ে খেও— (সবেগে প্রস্থান)

(ডাক্তার বসে রইলেন হতাশভাবে গালে হাত দিয়ে)।

দৃশ্যান্তর

পরের দিন—

বাইরের ঘর। ঘরে আর কোনও লোক নেই। কেবল ছোট মেয়ের একখানি ছেঁড়া আটহাতী শাড়ী পরে দেওয়ালের দিকে মুখ করে ডাক্তার তামাক সাজছিলেন। (হাতে টিকের কালী ও তামাকের দাগ) হঠাৎ পিছন দিক থেকে মেয়েলোকের গলায় কে ডাকল—"হেই, হেই" (ডাক্তার মুখ

ফিরিয়ে তাকালেন। তাকিয়ে দেখলেন, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে এক বুড়ী মেমসাহেব। পরনে একটা আধ ময়লা পোষাক।

মেমসাহেব—(অতি ব্যস্তভাবে) হেই! ডাক্তার চাকারবরটি কীধার হ্যায় ?

(ডাক্তার যেন বাক্‌শক্তি রহিত হয়ে গেলেন প্রথমটায়। হতভম্বভাবে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইলেন কয়েক সেকেণ্ড)।

মেমসাহেব—(চীৎকার করে উঠে) হেই বদমাস্ চাকর! জলদি বোলও ডাক্তার চাকারবরটিকো—যাও, উল্লু, বোলাও—

ডাক্তার—(থতমত খেয়ে) আই এ্যম ডক্টর চক্করবর্তী ম্যাডাম্! কেয়া মাঙ্‌তা আপ! হোয়াট ডু ইউ ওয়াণ্ট ম্যাডাম ?

মেমসাহেব—(প্রথমটায় যেন বিশ্বাসই করতে পারলে না নিজের চোখকে, তারপর একটু ধাতস্থ হয়ে) ওঃ, সরি ডক্টর। দেখিয়ে মেরা লিলিকো বহুৎ বেমারী হুয়া। কাল রাতসে পানিকা মাফিক টাট্টি, আই মীন পায়খানা হোতা হ্যায়।

ডাক্তার—উ টট্টি আভি বন্ধ নেই হোনেসে উ মর যায়েগা—চলিয়ে ডাক্তার চাকারবারটি চলিয়ে। একটো আচ্ছা দাওয়াই দেনা। ও হো, মাই পুয়ার লিলি (মেমসাহেব চোখ মুছল স্কার্টের কোণা দিয়ে)।

ডাক্তার—লিলি আপকো কোন হ্যায় ?

মেমসাহেব—লিলি ? উ হামারা সব কুছ হ্যায়—হামারা জান্, হামারা—কলিজা। এ দুনিয়মে হামারা যো কুছ হ্যায় সব কুছ লিলিকো লিয়ে। উ মর যানেসে হাম ভি মর যায়েগা উসকা সাথ সাথ। ও হো মাই ডিয়ার লিলি। ডাক্তার চলিয়ে জলদি, দের মাৎ করিয়ে—

ডাক্তার—ঠিক হ্যায়, আভি আতা হ্যায়, কামিং ম্যাডাম, স্যুন কামিং—থোড়া ওয়েট্ করিয়ে প্লীজ্—

(ডাক্তারের দ্রুত বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ)

ডাক্তার—(একটু চেঁচিয়েই) ও গিন্নী, গিন্নী—

(গিন্নী এসে দাঁড়ালেন বিরক্তি ভাব মুখে নিয়ে—হাতে রান্নার খুন্তী)

গিন্নী—কী হোলো কী ? চেঁচাচ্ছ কেন ?

ডাক্তার—(সোল্লাসে একটু চাপা গলায়) হবে আর কী ? এতদিন যা বলেছিলাম তাই আজ ঘটল। প্রতিভা বুঝলে, প্রতিভা।

গিন্নী—(খেঁকিয়ে উঠে) আরে কী হয়েছে বল্‌বে ত?

ডাক্তার—প্রকাণ্ড কেস্‌। বাঙ্গালী নয়, বেহারী নয়, এমন কি মাড়োয়ারীও নয়। খাস ইংরেজ তাও সাহেব নয় একেবারে মেমসাহেব। বুড়ীর অগাধ সম্পত্তি। তার একটি মাত্র ছোট্ট সুন্দর ফুট্‌ফুটে ফুলের মত মেয়ে কিংবা নাতনী—কাল রাত থেকে জলের মত পায়খানা করছে—এখন যায় তখন যায় অবস্থা। কলেরা—এশিয়াটিক কলেরা। মেমসাহেব—ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসেছে এই পারদর্শী শিশু-চিকিৎসক নিবারণ চক্রবর্তীর কাছে। তাড়াতাড়িতে গাড়ী বার করতে সময় পায়নি, পাগলের মত পায়ে হেঁটেই ছুটে এসেছে। ওঃ এশিয়াটিক কলেরা—একটি ডোজ ওষুধ—বাস্‌ পায়খানা বন্ধ। তারপর, ওঃ গাদা গাদা টাকা—মেমসাহেবের ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান—পরিবারের চিকিৎসক। চারিদিকে নাম—টাকায় টাকায় ঘর ছেয়ে যাবে—সেই আলিবাবার মত। (ব্যস্ত হয়ে) ওরে ও খেঁদি, খেঁদি কোথায়, কোথায় গেলি?—

(ডাক্তারের বছর দশেকের মেয়ে খেঁদি—এসে সামনে দাঁড়াল)।

খেঁদি—এই যে বাবা!

ডাক্তার—শীগ্‌গির আমার কাপড় জামা দে—

(খেঁদি ডাক্তারের একটা আধ্‌ময়লা ধুতি একটা হাফ-শার্ট আর ছেঁড়া সু এনে সামনে রাখল)।

ডাক্তার—আরে ছোঃ ছোঃ—আজ কি এই পোষাক পরে যাওয়া চলে? সাহেব বাড়ী—মস্ত সাহেব বাড়ী।—গিন্নী, দেখত, পুরানো ট্রাঙ্কটা খুলে বাবার সেই কোট প্যাণ্টটা বার করে আন ত!

গিন্নী—সে তোমার ছোটো হবে যে।

ডাক্তার—আন ত। তাড়াতাড়ি কর। মেমসাহেব ব্যস্ত হয়ে আবার অন্য কোনও ডাক্তারের কাছে চলে যাবে হয়ত।

(গিন্নী তাড়াতাড়ি গিয়ে ট্রাঙ্ক খুলে ডাক্তারের বাবার পুরানো একটা প্যাণ্ট আর একটা কোট নিয়ে এলেন)।

ডাক্তার—(প্যাণ্টটা পায় ঢুকিয়ে দেখে ভুঁড়ির কাছে আঁট্‌ছে না) ও গিন্নী এ যে আঁটে না পেটে। একটা দড়ি দাও প্যাণ্টটা বেঁধে নিতে হবে পেটের কাছে।

(গিন্নী খুঁজে খুঁজে একটা দড়ি এনে দিলেন)।

ডাক্তার—খেঁদি, পটলাকে ডাক—

(ডাক্তারের বারো বছরের ছেলে পটলাকে ডেকে নিয়ে এল খেঁদি)।

তোরা দুজন দুদিক থেকে খুব জোরে দড়িটা টান্, নৈলে আঁটছে না—

(ওরা দুজন কথামত জোরসে টান্‌তে লাগল, টানের চোটে দড়িটা ছিঁড়ে গেল)।

ডাক্তার—ছিঁড়লি ত? এখন কী হবে? ও গিন্নী আর একটা শক্ত দেখে দড়ি দাও।

গিন্নী—আর কোনও শক্ত দড়ি নেই।

খেঁদি—ঐ ছাগলের গলার দড়িটা খুলে আনব বাবা?

ডাক্তার—যা যা, তাই যা! মেমসাহেব চলে গেল কি না দেখত পটলা।

পটলা—(উঁকি মেরে) না বাবা যায়নি, বসে আছে।

(খেঁদি ছাগলের গলা থেকে দড়ি খুলে নিয়ে এল। ছাগলটা সেই ফাঁকে দিল ছুট)।

গিন্নী—(ব্যস্ত হয়ে) ছাগলটা পালাল যে।

ডাক্তার—পালাক গে। (একটু হেসে) একটা ছাগল পালালে তা কী হয়েছে। এর পর গরু হবে, মোষ হবে, ঘোড়া হবে, হাতী হবে!

(খেঁদি ও পটলা আবার দড়ি ধরে টান্‌তে লাগল দুদিকে সজোরে)।

ডাক্তার—পটলা, তোর কী চাই বল্?

পটলা—(একটু ভয়ে ভয়ে)—লাটাই, ঘুড়ি।

ডাক্তার—আরে দূর, দূর! সেদিন মুড়ির পয়সা চেয়ে মার খেয়েছিলি বলে ভয় পাচ্ছিস্ বুঝি। আর আজ আর সেদিন নেই। তোদের বাবা আজ প্রকাণ্ড বড়লোক। আচ্ছা, তোর জন্যে একটা ক্রিকেট বা টেবিল টেনিসের সেট এনে দেব। আর খেঁদি তোর জন্য কী আনব?

খেঁদি—(ইতস্ততঃ করে) একটা পুতুল।

ডাক্তার—দূর, পুতুল কি রে। তোর জন্যে তোর জন্যে—ছোট্ট সুন্দর সোনার চুড়ি। আর গিন্নী—তুমি পাশের বাড়ী গিয়ে রেডিও শুনে এস—তোমাকে একটা ভাল রেডিও সেট—

(দড়ি বাঁধা হয়ে গেল এতক্ষণে)।

(ডাক্তার কোটটা গায়ে চাপালেন। হাফ শার্টের খানিকটা বার হয়ে রইল। কোটটার বোতাম আঁটা গেল না ডাক্তারের প্রকাণ্ড পেটের উপর। ছেঁড়া

জুতোটা পায়ে কোনও রকমে ঢুকিয়ে তাড়াতাড়ি এসে দাঁড়ালেন মেমসাহেবের সামনে)।

ডাক্তার—চলিয়ে ম্যাডাম্।

মেমসাহেব—চলিয়ে। (উঠে দাঁড়াল)।

(ডাক্তার টেবিলের উপর থেকে কয়েকটা ওষুধ ভরা একটা ব্যাগ বগলে করে নিলেন)।

দৃশ্যান্তর

ডাক্তার ও মেমসাহেব রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন। তারপর দুজনে গলি পার হয়ে বড় রাস্তায় পড়লেন। বড় রাস্তার ধারে মেলা বড় বড় দু'তলা, তিনতলা, চারতলা বাড়ী।

ডাক্তার—(নিজে নিজে) আর কত দূরে যেতে হবে! একটা বাড়ীতেও ত ঢোকে না।

(মেমসাহেব—একটু এগিয়ে একটা সরু গলির মোড়ে একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর কাছে দাঁড়াল একটু)।

ডাক্তার—(একটু পিছন থেকে—নিজে নিজে) ওঃ বাবা! কত বড় বাড়ী! বেজায় বড়লোক দেখছি!

(মেমসাহেব সে বাড়ীতে না ঢুকে সরু গলিটার মধ্যে ঢুকে পড়ল)

ডাক্তার—(নিজে নিজে) যাঃ চলে। এ বাড়ীতেও ঢুকল না। এই পচা সরু এঁদো গলিতে থাকে বুড়ী—।

(ভাঙ্গা একটা একতলা বাড়ীর সামনে এসে)।

মেমসাহেব—আইয়ে ডাক্তার, ইয়ে হামারা কোঠী।

(ডাক্তারের চোখ-মুখের চেহারা বদলে গেছে)।

ডাক্তার—(নিজে নিজে) বুড়ী হাড় কিপ্টে। হাজার হাজার টাকা জমিয়েছে না খেয়ে-দেয়ে—তাইতে ঐ নোংরা পোষাক ঠিক আমার ঝুনু পিসীর মত ব্যাঙ্কে লাখ টাকা অথচ পরনে ছেঁড়া ব্লাউস আর শাড়ী, খায় আলু ভাতে আর ভাত। দেবে ঐ মেয়ে না নাতনী—ঐ সব টাকা উড়িয়ে দেবে—যাই হোক আমার ফী ত দেবে এখন, তারপর ঐ মেমসাহেব মরলে পরে ঐ লিলিরই আমি হব ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান বাঁধা ঘরের ডাক্তার।

(ওরা এতক্ষণে মেমসাহেবের বাইরের ঘরে উঠে এসেছে)।

মেমসাহেব—(ঘরের কোণে একটা খাটিয়ার কাছে গিয়ে)—লিলি, মাই ডীয়ার লিলি—মাই হার্ট।

ডাক্তার—(কিছু বুঝতে না পেরে) আপকা লিলি কীধার হ্যায়?

মেমসাহেব—(খাটিয়ার উপর শোয়া একটা দেশী রোগা কুকুরের বাচ্চাকে দেখিয়ে) এহিত লিলি হ্যায় হামারা জান, ই দুনিয়ামে হামারা সব কুছ হ্যায় ইয়ে। দিজিয়ে একটো দাওয়াই ইসকো ডাক্তার।

ডাক্তার—(বোমা ফাটার মত চীৎকার করে উঠে)—হোয়াট্? হাম ভিটারনারী সার্জন—পশু চিকিৎসক হ্যায়?

মেমসাহেব—(রেগে উঠে) পশু চিকিৎসক নেহি হ্যায়? তুমারা নেম প্লেট্‌মে লিখা হ্যায় নেহি—ডাক্তার নিবারণ চাকারবরটি পশু চিকিৎসক। হাম থোড়া থোড়া বাংলা পড়নে সাকৃতা হ্যায়। জরুর লিখা হ্যায়।

(ডাক্তার রাগে কাঁপতে কাঁপতে মেমসাহেবের বাড়ী থেকে বার হয়ে ছুট্‌তে ছুট্‌তে বাড়ী চলে এলেন। বাড়ী এসে তাঁর নেম প্লেট্‌টায় দৃষ্টিপাত করলেন বহুদিন পরে)।

ডাক্তার—(অস্ফুটস্বরে) সত্যিই ত পশু চিকিৎসকই ত লেখা রয়েছে। রোদে পুড়ে, জলে ভিজে আমার নাম অস্পষ্ট হয়ে গেছে। শিশু চিকিৎসকের শিশুর 'ই'-কার একেবারে কবে মুছে গেছে শিশু হয়েছে 'শশু'। আর 'শ' টাও 'শ' কি 'প' তাও বোঝা দুষ্কর। তারপর অল্প বাংলা পড়তে শেখা—বুড়ী মেমের চোখে শিশু 'পশু' হয়ে যাওয়া আশ্চর্য না।—

(ডাক্তার নেম প্লেট্‌টা খুলে টান মেরে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিলেন তারপর হতাশভাবে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন নিজের বাইরের ঘরের দরজায়, চোখে তখন তাঁর জল)।

কবিতা

উড়ল যে আকাশে

এক লাফে রামদীন উড়ল যে আকাশে
ভজুয়ার পিসে হয়, কালুয়ার কাকা সে
আকাশে উড়েই বলে—"শীত করে বড় যে,
লেপ-কাঁথা পাঠা তোরা নিজেদের গরজে।
ভজুয়াটা ঠ্যাং খোঁড়া চলিস্ তো খুঁড়িয়ে,
কালুয়াটা কালাজ্বরে গেছিস্ তো বুড়িয়ে,
আমি যদি মরি, তবে তোদের কি হবে বল্,
দুঃখ ও কষ্টের কোনোক্রমে পাবি তল ?—"
ঘুম থেকে উঠে ঐ ভজুয়া ও কালুয়া
আরামসে খাচ্ছিল রোটী দিয়ে হালুয়া।
রামদীন কি যে বলে যেই তারা শুনল,
মনে মনে নিজেদের প্রমাদটা গুনল।
ছুটে গিয়ে লেপ কাঁথা ছুঁড়ে দিল শূন্যে,
বেঁচে গেল রামদীন বাপ-মারই পুণ্যে।
লেপ-কাঁথা গায়ে দিয়ে ঘুমোল সে আরামেই,
ঘুমোতে ঘুমোতে ঘোরে, কোনো তার সাড়া নেই
কত যুগ কেটে গেল আজও তো সে ঘুরছে,
বিজ্ঞানী যত দেশ খালি মাথা খুঁড়ছে,
তাদের 'রেকর্ড' সব গেল বুঝি ভেস্তে,
'সিন্নী' মানত করে গিয়ে 'বুদাপেস্তে'।
সারা জগতের লোক শুধু খালি ভাবছে,
ঘুম ভেঙে রামদীন কবে নিচে নামছে ?